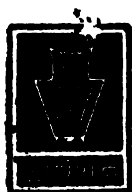
সূর্যস্নাতা

সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়



২২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ—১৩৬৫

প্রচ্ছদশিল্পী—পি, গুপ্ত
ব্লক নির্মাতা—রয়্যাল হাফটোন কোং

দেশবাণী মুদ্রণিকা, ১৪-সি, ডি. এল. রায় স্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীপিয়ারীরঞ্জন সাহ কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
পুথিঘরের পক্ষ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতি অনিমা দেবী

মামা-মামীমাকে

॥ এক ॥

আয়তনে বড় বলেই যে এ বাড়ীর নাম বড়বাড়ী, তা নয়। অনেক কাল আগে যাঁরা এ-বাড়ীতে বাস করতেন, তাঁদের দিল বড় ছিল। যশে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে তাঁরা দেশের মধ্যে গণ্যমান্য ছিলেন। তাই এর নাম বড় বাড়ী। তাঁরা বিগত শতাব্দীর মানুষ। আজকাল তেমন মানুষ চোখে পড়ে না এ-বাড়ীতে। বড় বাড়ীর চেহারা বদলে গেছে, মানুষগুলোরও সেই দশা। ভগ্ন-প্রায় বড় বাড়ীর ইটের স্তূপ শুধু বড়বাড়ী নামটাই বহন করে আসছে। এর খোপে খোপে যারা আজ বাস করছে, তাদের দেহে বইছে পূর্ব পুরুষের রক্ত। কিন্তু তারা সেই আভিজাত্য হারিয়েছে।

এই বাড়ীর সুনাম রাখতে যত্নের ত্রুটী থাকত না এর পুরনো আমলের বাসিন্দাদের। আজকাল এই বাড়ীর দুর্নামে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠলেও মানুষগুলো নির্বিকার। যেমন নির্বিকার তারা, বিরাট বাড়ীটার অর্ধেক ক্ষয়ে যাওয়া ইটগুলোর বিকৃত চেহারা দেখে। দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে থাকলেও কারো মাথা ব্যথা নেই মেরামত করার। ভাগের মায়ের গঙ্গালাভ হয় না যেমন।

কালধর্মে সব কিছু বদলায়। সে আমলের মানুষেরা আজকের মত দিনের আলো না ফুটতেই ছুটতেন না কল-কারখানায়। যজমানী, পণ্ডিতী করে তাঁদের দিন কাটতো আরামে। গ্রামে ছিল পুকুর, আমবাগান, কলাবাগান। দোরোতে ধানজমি। নৌকো করে মাঝিরা সম্বচ্ছরের চাল ঘরে এনে পৌঁছে দিত। গরুর জন্য বিচালী। তার সঙ্গে মাটির ভাঁড়ে করে গাওয়া ঘি। কর্তারা হবিষ্যান্ন আহার করতেন গাওয়া ঘি দিয়ে। আজ সে সব স্বপ্নের মত মনে হয়। জমি মধ্যস্বত্বভোগীর হাতছাড়া হয়ে গেছে। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে জমিজমা দেখা শোনা করা এখন আর সম্ভব হয় না। সেদিন আর নেই।

বড় বাড়ীর এখনকার বাসিন্দেদের রোজগেরে পুরুষগুলো ভোর হতে না হতেই ছোটে চাকরিতে। কেউ হুগলী নদীর এপারে সুতোর কলে, কেউ ওপারে চট কলে। ওরি মধ্যে দু'চারজনের বরাত ভাল। কলকাতায় সওদাগরী অফিসে চাকরি করে মোটা মাইনের। কিম্বা করে স্কুল মাষ্টারী।

ইদানীং অনেকগুলো কলকারখানা হয়েছে। ইলেট্রিক সাপ্লাই, ব্যাটারী, কেবল্, দালদা কারখানা। বড় বাড়ীর উঠ্‌তি বয়সের ছেলেগুলো সুযোগ সুবিধে বুঝে কোনো একটাতে ঢুকে পড়েছে। দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখছে আজকাল। একদিকে রোজগার করছে, আর একদিকে পয়সা ওড়াচ্ছে। দিন দিন বেশভূষার পরিবর্তন হচ্ছে। জলুস বাড়ছে চেহারায়। বিলাসিতা বাড়ছে। কিন্তু বড়বাড়ীর হাড়জিরজিরে অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। অতীতের নীরব সাক্ষী বড়বাড়ী এখনকার বাসিন্দেদের হালচাল দেখে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোনরকমে।

বড়বাড়ীর ঘরগুলোতে আলোবাতাস খেলে না তেমন। কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব। জৈবিক নিয়মে এখানে নতুন মানুষ ভূমিষ্ঠ হয়। পুরনো মানুষ বিদায় নেয়। বয়স বাড়ে ছেলেদের। মেয়েদেরও বয়স বাড়ে। যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা স্বামীর ঘর করতে যায় না। বাইরের আলোবাতাসের জন্যে ছটফট করে তারা। কেউ সাহস করে পথে বেরোয়। কেউ স্যাঁতসেঁতে ঘরে পুড়ে মরে কামনার আগুনে।

এ বাড়ীর মেয়েদের পথে বেরনো আগেকার আমলে নিন্দনীয় ছিল। এখন তারাই আগে পথে বেরোয়। গ্রাম্য রাজনীতিতে প্রথম এগিয়ে আসে। আত্মনিয়োগ করে সমাজ-সেবায়। রাজনৈতিক সভামঞ্চে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়। অভিনয় করে। চাকরি করতে এগিয়ে যায়। অসবর্ণ বিবাহ করে।

বড়বাড়ীর সিং দরজা আগে রাত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ করা হতো। কড়াহুকুম থাকতো কর্তাদের। যে যার কাজ সেরে সেই

সময়ের মধ্যে বাড়ী ফিরতে হবে। দেরী হলে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হত। আজকাল সে দরজা সব সময়ে খোলা। তার নীচের দিকটা খসে গেছে। সেটা যেন কুষ্ঠ রোগীর মতো দেখায়। সেখান দিয়ে কুকুর, ছাগল নির্বিবাদে যাতায়াত করে। সিংদরজা দিয়ে ঢুকে ত্বপাশে উঁচু দেউড়ী। কোমর সমান উঁচু। পূজোর বাজনদাররা এখানে বসে। এ ছাড়া এখন আর কোনো কাজে লাগে না। দেউড়ী পেরিয়ে বিরাট উঠোন। দক্ষিণে বাঁধানো মঞ্চ। কালেভদ্রে থিয়েটার জলসা হয়। বাঁদিকে এক মানুষ উঁচু পূজোর দালান। সাদা আর কালো পাথরের চিক দেওয়া মেঝে; পায়রার বিষ্ঠায় ঢাকা পড়ে গেছে। পূজোর সময় কলসী কলসী জল ঢেলে সাফ করা হয়। পাশে সারি সারি ঘর। সেখানে দেবতার ভোগরাগের আয়োজন হয়। ঘরগুলোর মেঝের সান ওঠা। মাটির মেঝে বল্লেই হয়।

উঠোন পেরিয়ে তিনভাগ বিভক্ত বড়বাড়ীর গৃহশ্রেণী। এক একভাগ যেন এক একটি পাড়া। লোকসংখ্যার হিসেবে কথাটা অযৌক্তিক নয়। একভাগের সঙ্গে অন্যভাগের সম্পর্ক মধুর বলা চলে না। যদিও তাদের মধ্যে বিরাট মহীরুহের শাখাপ্রশাখার মত সম্পর্কের বহুল বিস্তার।

একেবারে দক্ষিণের গলিতে ঢুকে বাঁয়ে প্রথম যে দরজা, সেটি নীরেন চাটুজ্যের অংশ। ত্ব'খানা শোবার ঘর। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বাথরুম আর পায়খানা। বয়স যত না, নীরেন তার চেয়েও বেশী বুড়িয়ে গেছেন। তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়, অনেক ঝড় বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। সংসারটিও কম নয়। অনেকগুলি ছেলে মেয়ে। তারওপর বিধবা ছোট বোনের সংসার ঘাড়ে। চটকলের সামান্য আয়। ভোর বেলা বেরিয়ে যান নীরেন। গঙ্গা পার হয়ে ওপারের জুটমিলে ছটায় হাজরে দিতে হয়। মুখে তাঁর সর্বদা চিন্তার ছাপ ফুটে থাকে। সব সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক।

কারণ আছে। প্রথম শোক পেয়েছেন ভায়ের কাছ থেকে। মারাত্মক শোক। এক যুগ পার হয়ে গেছে, ভাই দেশান্তরী। বেঁচে আছে কি নেই, ঈশ্বর জানেন। শোকটা নিরুদ্দিষ্ট ভায়ের জন্যে নয়। তার দেওয়া আঘাতের জন্যে।

ইদানীং তাঁর মনের অশান্তি বড় ছেলেকে নিয়ে। বড় ছেলে সুধীরের মতি গতি দেখে এক তিলার্ধ শান্তি পান না নীরেন। বাউণ্ডুলে। কোন দিকে হুঁস নেই। না নিজের সম্বন্ধে। না ভাই বোন, বাপ-মা, সংসার সম্বন্ধে। একটি পয়সা রোজগারের নামগন্ধ নেই। তার বয়সী ছেলেগুলো কেমন দু'পয়সা রোজগার করে আনছে। আর উনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছেন।

তাঁর স্ত্রীর ধারণা কিন্তু ঠিক উল্‌টো। বড়বাড়ীর সেকালের কোন মান্যি গণ্যি পুরুষ তাঁর ছেলে হয়ে এসেছেন। একটা সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতেও দেরী হয় না। নীরেন স্ত্রীর কথা শুনে রেগে যান ; মুখের আকৃতিটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যায় তাঁর। খুব তেঁতো খাওয়া মুখের চেহারার মত।

—থামো তুমি ; মহাপুরুষ! তাঁদের পায়ের নখের যুগ্যিও যদি তোমার ব্যাটা হত তাহলে আজ আমার এত দুঃখ হত না। মহাপুরুষ না ছাই, একটা অপদার্থ!

নীরেনের সেই অপদার্থ ছেলের কথা পরে অনেকবার আসবে। তাঁর গুণধর ভাইএর কথাটা আগে বলে নেওয়া দরকার। ধীরেনের কথা। এক যুগের ওপর হ'য়ে গেছে, যার কোন হদিশই নেই। যার কথা শুধু গ্রামের মানুষ নয়, বড়বাড়ীর মানুষরাও ভুলে গেছে, কিন্তু নীরেন ভোলেননি। আর ভোলেননি তাঁর বিধবা বোন। মানুষের শোক ভোলা যায়, পয়সার শোক বোধ হয় কোনদিন ভোলা যায় না।

লোকে তাকে ভুলে গেলেও গ্রামে সেদিন ধীরেন স্বনামধন্য পুরুষ। বড়বাড়ীর আজকালকার বাসিন্দাদের প্রথম, প্রতিভূ।

শুধুই প্রথম নয়, আজ পর্যন্ত অনন্য। দুনিয়ার তাবৎ লোককে কথায় বশ করার এক আশ্চর্য যাদু তাঁর জানা। চেহারায় তাঁর যেমন একটি বিস্ময়কর আভিজাত্য ছিল, আচরণে ছিল তেমনি নীচতা। মানুষের মুখ দেখলে মনের ভাব কিছুটা অনুমান করা যায়, এই থিওরি অন্ততঃ ধীরেনের বেলায় খাটেনি। তাঁর মুখে যখন ফুটে উঠতে দেখা গেছে শুচি শুভ্র হাসি, ঠিক সেই সময়েই তিনি হয়ত কার সর্বনাশের ষড়যন্ত্রে তৎপর।

অনেক দোষের ভেতর ধীরেনের সামান্য গুণও ছিল। পাঁকে যেমন পদ্মের জন্ম। ধীরেনের সে গুণও তেমনি দোষজাত। তাহলেও সেটা তার গুণ। তাঁর জন্যেই সেবার কেলেঙ্কারীর হাত থেকে বেঁচেছিলেন গোলাপী খুড়ী। বড়বাড়ীর খোপে খোপে অগুণতি পরিবার। সামনা সামনি ঘর। এ বাড়ীর সঙ্গে ও বাড়ীর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা চোখে পড়ে না কারো। গোলাপী খুড়ির মেয়ের অবৈধ গর্ভসঞ্চার হয়েছিল। গোপনে গোলাপী খুড়ী ধীরেনকে বলেছিলেন—তুই একটা বিহিত করে দে বাবা।

করে দিয়েছিলেন ধীরেন। তারপর যখন সেই মেয়েটির বিয়ের সম্বন্ধ এল তখন তিনি জোর গলায় বললেন পাত্রপক্ষকে—স্বভাব চরিত্তির বলুন, রূপ গুণ বলুন, কাজে-কম্মে বলুন, এমন মেয়ে যে সে ঘরে পাবেন না। সাক্ষাৎ তর্কপঞ্চাননের বংশ বলেই—

আর একটি বিষয়ে ধীরেন ছিলেন সবার চেয়ে আলাদা। তিনি আর পাঁচজনের মত কল কারখানায় ছোটেননি জীবিকার জন্যে। এ ব্যাপারে তাঁর একটা নিজস্ব মতামত ছিল। বরাবর তাঁর ব্যবসার দিকে ঝোঁক। অবশ্য ছোটখাট ব্যবসার দিকে কোনোকালেই তাঁর মন ছিল না। বিরাট ব্যবসা করার পরিকল্পনা সব সময় ঘুরত তাঁর মাথায়। তাঁর বড় বড় কথা শুনে রাগ হতো নীরেনের। মাঝে মাঝে অবজ্ঞার হাসি হেসে বলতেন—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিস নাকি? তার চেয়ে যা বলি, তাই কর। ছোটখাটো একটা মুদীখানা—

বিরক্তিতে কুঁচকে যেত ধীরেনের সারা মুখটা। দাদার কথার মধ্যেই বলতেন—খবরদার বলছি দাদা, আমাকে তুমি অমন আণ্ডার-এষ্টিমেট করো না। আমি কি কর্বো, হাতে-নাতে তা দেখিয়ে দোব। জীবনে হাই এ্যাম্বিসান্ না থাকলে সে আবার মানুষ।

—আমরা তাহলে কি?

—তোমরা কী তা তোমরাই জান। চটকলের বাবু। তারা আবার মানুষ নাকি? একটুও না রেগে নীরেন ভাইকে জিগ্যেস করতেন—তোর মতলবখানা কি?

—বিরাট ব্যবসা ফাঁদব।

—মূলধন যোগাবে কে?

—সে যোগাড় করেছি। ঘোড়া হ'লে চাবুকের অভাব হয় না।

—বটে? বেশ! যা ভাল বুঝিস কর। মোদ্দা কথা হ'ল ব'সে না থেকে যাহোক কিছু করা চাই, বড় বড় বুলি ঝেড়ে সময় নষ্ট করিস নি।

ধীরেন চুপ চাপ বসে থাকার পাত্র নন। বড় রকমের ব্যবসা ফেঁদেছিলেন কিছুদিন বাদেই। মুলধনের জন্যে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। খুব সহজেই এক বড়লোকের ছেলের ঘাড় মটকেছিলেন। তারই বৈঠকখানায় এক তাজ্জব ব্যবসা সুরু করেছিলেন তিনি। তাজ্জবই বটে। বাজারে মালের চাহিদা যাচাই না করে যে ব্যবসা ফাঁদা হয় সেটা তাছাড়া আর কী। জনবহুল শহরে হ'লেও কথা ছিল। কিন্তু স্বল্পবিত্ত অধ্যুষিত এই ছোট্ট শহরতলীতে কলের গানের ব্যবসা অচল। ধীরেনের সেই সুসজ্জিত দোকান থেকে দিনরাত কলের গান ভেসে আসত। কর্মব্যস্ত মানুষের সে গান শোনার ফুরসৎ ছিল না। দোকানে পদার্পণ করার বিলাসিতা কারুরই ছিল না। কৌতূহলী শিশুরা হয়ত আশে পাশে দাঁড়িয়ে শুনত। কিন্তু তাদের ভেতর একজনও ক্রেতা ছিল না।

গ্রামোফোনের যত পিন ষ্টকে ছিল সেগুলো শেষ হ'তে লাগল মাস ছয়েক। তার ভেতর দোকানে একটি পয়সাও বিক্রী হয়নি।

পিন ঘুরিয়ে'যেতে কলের গানও থেমে গেল। তারপর সে দোকানের কী হাল হ'ল, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানোর দরকার মনে করেনি।

নীরেনের মুখে দেখা গেল দুশ্চিন্তার রেখা। ভাইকে সামনা সামনি পেয়ে একদিন শুনিয়ে দিলেন—গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে। তখনি বলেছিলাম—

শেষ অবধি ধৈর্য ধ'রে শোনা ধীরেনের কুষ্ঠিতে লেখা নেই। বললেন—যা জানো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।

কথা শুনে পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে যায় নীরেনের। বিরক্ত ভাবে ভায়ের মুখের পানে তাকান তিনি। দুজনের বয়সের তফাৎ অনেকখানি। ছ'সাত বছরের কম নয়। বড় ভাই ব'লে এতটুকু সমীহ করে না ধীরেন। কথাবার্তা এমন, যেন তিনি ওর ইয়ারকির পাত্র। শুনলে গা জ্বালা করে। একটু রেগেই নীরেন বলেন—কলের গানের ব্যবসা ক'রে কি লাভ করলি শুনি? এটা কি কলকাতা যে লোকে কলের গান কিনবে? নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরোয়, তারা কিনবে কলের গান! তার চেয়ে—

—থামো, থামো, কী বলবে বুঝতে আমার বাকী নেই। তার চেয়ে কল ঠেঙানো ভালো, এই কথা বলবে ত?

—না, ব্যবসাই কর না। কল ঠেঙাতে কে বলছে তোকে। ব্যবসা তো ভালই। যোগীন পাল মুদীর দোকান ক'রে—

—আঃ, ফের সেই এক কথা, মুদীর দোকান, মুদীর দোকান। ও সব আমার দ্বারা হবে না। ব্যবসা করতে হ'লে ভদ্রলোকের ব্যবসাই করবো বুঝলে? এই দাঁড়ি পাল্লা ধ'রে নুন তেল ওজন করা হবেনা আমার।

—তবে কর গিয়ে যা তোর খুশী। আমি আর একটি কথাও বলব না। ধীরেন এই সুযোগই খুঁজছিলেন। কতক্ষণে দাদা আত্ম-সমর্পণ করবেন। তাঁর ইচ্ছেটাকেই মেনে নেবেন মুখ বুজে। সেই অবসরে বলা যাবে আসল কথাটা। মূলধন চাই। কাপড়ের ব্যবসা করবেন এবার। এতে প্রচুর লাভ।

দিনের পর দিন যুক্তি হ'ল ছ'ভায়ে। স্বভাবচতুর ধীরেন দাদাকে বোঝালেন কাপড়ের ব্যবসার সুযোগ সুবিধে কতখানি। মূলধন বিনিয়োগের জন্য তাঁকে উৎসাহিত করলেন। নীরেনের ইচ্ছে ছিল না, সব সঞ্চয়টুকু ভায়ের হাতে তুলে দেন। কিন্তু মতিভ্রমের মন্ত্রদাতা ধীরেন শেষ পর্যন্ত হাজার পাঁচেক টাকা দাদার কাছ থেকে আদায় করলেন। মাসে মাসে লাভের স্ফীত অঙ্ক যেভাবে দেখান হ'ল, তাতে নীরেন আর লোভ সামলাতে পারলেন না।

এবার কাপড়ের ব্যবসা সুরু করলেন ধীরেন। গস্ত করতে বড়বাজার যান। সেখানে ছ'চার দিন কাটিয়ে আসেন। এসে বড় বড় ধনী-ব্যবসাদারের গল্প করেন দাদাব কাছে। আশায় চিক চিক ক'রে ওঠে নীরেনের মুখ চোখ। কল্পনা ক'রে খুশী হন, কাপড়ের দোকানখানা দাঁড়িয়ে গেছে। ছ'হাতে মুঠো মুঠো টাকা রোজগার ক'রে ঘরে আনছে ধীরেন। সংসার স্বচ্ছল হ'য়েছে। তাঁর টাকা ফেরৎ দিয়ে সামান্য কয়েক মাসেই জমিয়ে ফেলেছে ব্যবসায়ের মূলধন।

এই সময়ে একটি ছুর্ঘটনা ঘটে। কল্পনা সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেল আকাশ কুসুমেব মত। মাথায় হাত দিয়ে বসলেন নীরেন।

বড় বোনের শশুরবাড়ী বালী। ছোট বোনের বিয়ে হ'য়েছিল বেলঘরিয়ায়। ছোট বোন চার চারটী সন্তান নিয়ে বিধবা হলেন। বড় ছেলের বয়স দশও হয়নি। স্বামীর যৎসামান্য আয়ে চলে যেত কোন রকমে। পুঁজিপাটা কিছু ছিল না। মাথাগোঁজার একটু আশ্রয় ছাড়া।

ছোটবোনের বিপদে পাশে এসে দাঁড়ালেন ধীরেন। যথারীতি সান্ত্বনা দিলেন। শ্রাদ্ধ শান্তি মিটল। তারপরই বোনকে জানালেন —তুই ছেলেমানুষ, একা এখানে বাস করতে পারবি না। চল্, আমাদের একমুঠো জুটলে তোদেরও জুটে যাবে।

বোন চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন—কিন্তু স্বামীর ভিটে ছেড়ে কী ক'রে যাই দাদা?

—কেন, বিক্রী ক'রে দিয়ে যাবি। এ তো সোজা কথা।

—কী যে বল দাদা। এটুকু গেলে মাথাগোঁজার ঠাঁই থাকবে না। চিরদিন পরের বোঝা কে বইবে বল?

—পরের বোঝা? তুই পর হলি কবে থেকে?

—আমি না হয় পর নই, এরা? কথায় বলে জন, জামাই, ভাগনা তিন নয় আপনা। না দাদা, এখানেই কষ্টে শিষ্টে ওদের যা হোক ক'রে মানুষ করবো।

—ওরা এখানে পড়ে থাকলে মানুষ হবে ভেবেছিস?

—ঝিগিরি করেও ওদের মানুষ করবো দাদা—

—কী যে বলিস! আমরা এমন ভাই থাকতে—

বলা বাহুল্য, বোনের কানেও ধীরেনের মন্ত্র ফলবতী হল। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বোন ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বাপের বাড়ী এসে উঠলেন। বাড়ী বিক্রীর হাজার দশেক টাকা রইলো ধীরেনের হাতে। তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। দাদা আর বোনের মিলিয়ে পনের হাজার টাকা নিয়ে ধীরেন নিরুদ্দেশ। বারো বছর পার হয়ে গেছে তারপর। আজো তাঁর কোন সন্ধান নেই। বেঁচে আছেন কী নেই, সে খবর জানে না কেউ।

নীরেন সেই টাকার শোক আজও ভুলতে পারেন নি। টাকার শোক বড় শোক। ভোলা সহজে যায় না। মনে মনে প্রত্যহ অভিসম্পাত করেন ভাইকে। নিজের সর্বনাশ তো হয়েছেই। বোনটার সর্বনাশও করে গেল হতভাগা। মানুষ নয়, পশু, পশু।

॥ দুই ॥

সামনে গড়। তাই বুঝি গ্রামখানিব নাম শ্যামনগর। এ সমস্ত এলাকা একদিন ছিল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারে। বর্গীব হাঙ্গামার ভয়ে বর্ধমানের রাণী বিষ্ণুকুমারী এসে বাস করেছিলেন কিছুকাল। বর্গীবা উদ্বাস্তু করেছিল তাঁকে। রাণী প্রাসাদ নির্মাণ কবে গড় খনন করিয়েছিলেন তাব চারপাশে। গড় আজো রয়েছে। প্রাসাদ পবিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। বন আর কাঁটাঝোপেব আড়ালে তার অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। কোনও উৎসাহী প্রত্নতাত্ত্বিকও সাপের ভয়ে তাব ভেতর যেতে সাহস করেননি।

বহু বছর বাদে বনজঙ্গল বেষ্টিত শ্যামনগরে আসতে সুরু করলেন নতুন উদ্বাস্তুর দল। পূর্বপাকিস্তান হতে এঁরা পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় প্রার্থী হয়ে এলেন। দেখতে দেখতে বদলে গেল গ্রামের চেহারা। ছাড়া ছাড়া শ'খানেক ঘর বসতি ছিল আগে। বাদবাকী বন আর বন।

এখন উদ্বাস্তুদের কল্যাণে আমবাগান, বাঁশবাগান খালি পড়ে নেই। যেটা আগে ছিল সত্যি, এখন সেটা প্রবাদের মত শোনায়। আম, নারকোল বাঁশের কোঁড়। তিন নিয়ে শ্যামনগর। গ্রামের সেই সবুজ সমারোহ আজ আর নেই। নেই সেদিনের সেই অঢেল ফলমূল। গ্রামের সেই শ্যামলা মেয়ের মত মিষ্টি চেহারাটির স্মৃতি বোধ হয় মুছে গেছে পুবনো বাসিন্দের স্মৃতি থেকেও। যেমন এখানের নতুন মানুষেরা জানেনা পুবানো নামটা, মূলাজোড়।

অনেকগুলো উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে উঠেছে গ্রামেব চারপাশে। হিন্দুস্থানকলোনী, গান্ধীনগর কলোনী। রবীন্দ্রপল্লী, ক্ষুদিরাম ও

গুড়দহ কলোনী। অঞ্জনগড়, শান্তিগড়। শেষোক্ত কলোনীদুটির উদ্বাস্তুরা তাঁদের পূর্বসূরী বিষ্ণুকুমারীকে স্মরণ না করে পারেননি।

বদলে গেছে সব। লোকসংখ্যা বেড়েছে। সমস্যাও বেড়েছে। পৌরকর্তারা নিত্য গালমন্দ শুনছেন করদাতাদের কাছে। জল-নিকাশের ব্যবস্থা নেই। রাস্তাঘাটে হাঁটা যায় না। পানীয়জলের অভাব। নর্দমা সাফ করার মেথর নেই।

নয়নপুর পৌরসভার, আতপুর-শ্যামনগর ওয়ার্ডের কমিশনার নরেশ কুমার ব্যানার্জী। চুলে পাক ধ'রেছে। সুপুরুষ। বয়স তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখলে অত মনে হয় না।

নরেশকুমার নিজের বৈঠকখানায় গা এলিয়ে বসেছিলেন। সকাল থেকে একের পর এক লোক এসেছে, হাজার রকম নালিশ নিয়ে। ওদের অভিযোগের যেন শেষ নেই। চাওয়ারও অন্ত নেই। তিন বছর তিনি কমিশনার আছেন। একটা টার্ম শেষ হয়ে এলো প্রায়। এর মধ্যে অনেক কাজ করেছেন তিনি। বাসুদেবপুর রোড, ভারতচন্দ্র পথ, ব্যানার্জীপাড়া রোড্ পিচের হয়েছে। আলো গেছে হাই স্কুল অবধি। গুড়দা কলোনী পর্যন্ত জলের পাইপ বসেছে। টিউবওয়েল বসেছে অসংখ্য।

তবু ওরা নিন্দা করে। বলার কিছু নেই। সামনে ইলেকসান, আগের মত এবার জেতা সহজ হবে না। অনেকে এবার দাঁড়াবে শোনা যাচ্ছে। আপন মনে হাসলেন নরেশ কুমার। কমিশনার দাঁড়াবে। মশা হয়ে কামান দাগার শখ।

বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। লোকের ভীড় নেই আর। ঘর খালি। তবু নরেশ স্নানাহার করবার জন্যে উঠলেন না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়টা দেখে নিলেন। তারপর টেবিলে রাখা পানের ডিবে থেকে একটা পান নিয়ে মুখে পুরলেন তিনি। এখনো একজনের আসার কথা আছে। উমা খবর দিয়েছে, আজ নিশ্চয় দেখা করবেন ভদ্রলোক। এগারোটা নাগাদ আসার কথা ছিল।

কিন্তু এত দেরী করছেন কেন তিনি। মনে উৎকণ্ঠা নিয়ে নরেশ টেবিলের ওপর পা তুলে দোলাতে স্নুরু করলেন।

হ্যাঁ, ভদ্রলোক আসছেন মনে হয়। সোজা হয়ে বসলেন নরেশ। ডাক দিলেন আন্তরিকতার সঙ্গে—ভেতরে আসুন। আপনিই তো দ্বিজেনবাবু?

—আঁ্যাজ্ঞে হ্যাঁ। দ্বিজেনবাবু দু'হাত তুলে নমস্কার করে বসলেন একটা চেয়ার টেনে। সুন্দর চেহারা। দেখে শিল্পী ব'লে চিনতে দেরী হয় না। পরনে মিহি পাড় পাতলা ধুতি। গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী। গলায় সরু চেন-হার। ঘাড় অবধি ঝুলে পড়া একরাশ চুল মাথায়। বয়স বছর পঁচিশেক হবে।

নরেশ এক পলকে তাকে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে তাঁর কপিশ রঙের দৃষ্টি দ্বিজেনের মুখের উপর রেখে বললেন—উমার মুখে শুনলাম, আপনি এখানে একটা মিউজিক এণ্ড ড্যান্স্ স্কুল খুলতে চান।

—আঁ্যাজ্ঞে হ্যাঁ, উমাদির কাছে জেনেছি, আপনি এ ব্যাপারে ইন্টারেষ্টেড্। শুনলাম, এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে। তাই সাহস করে এসেছি। অবশ্য নৈহাটিতে আমার স্কুল আছে।

—বেশ তো, আরম্ভ করে দিন। আমি ঘরের ব্যবস্থা করে দেব। প্রচুর ছাত্রছাত্রী হবে। উমা যখন রয়েছে, তার জন্যে ভাবতে হবে না। আমাদের বেসুরো গাঁটাতে একটু গানবাজনা চালু করুন দেখি। এ একটা উঁচু দরের আর্ট।

—নিশ্চয়ই। আপনাদের সহানুভূতি থাকলে স্কুল দাঁড়িয়ে যাবে। বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া অন্ধ বলাই বৈরাগী গান শেখাবেন। তারের যন্ত্র শেখাবার ভালো ভালো শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছেন।

—ভালোই হ'ল। আসুন, আপনাকে ঘরটা দেখিয়ে দি। দেখুন, আপনার স্কুল খোলা চলবে কিনা।

দ্বিজেনকে নিয়ে নরেশ বেরিয়ে এলেন বৈঠকখানা থেকে। বাড়ীর সামনে একটা পুকুর। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে পুকুরটা বুজোবার ব্যবস্থা ক'রেছেন তিনি। ভারতচন্দ্র পথ থেকে লরী বোঝাই কয়লার ঘেঁস ঢালা হ'চ্ছে পুকুরে। কতকগুলো হিন্দুস্তানী বুড়ী কয়লা কুড়োচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েও রয়েছে অনেক-গুলো। মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। অসহ্য বোধ হচ্ছিল নরেশের। ওরা কেমন অক্লেশে খুঁটে খুঁটে কয়লা ডালায় ভরছে। নরেশ একবার ওদের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন। বাড়ীর কাছেই তাঁর কারখানার লাগোয়া একটি আধুনিক ডিজাইনের বাড়ী। বাইরে দরজার ডানদিকে শ্বেতপাথরে লেখা বিশ্রাম-কুঞ্জ।

সদর দরজার নক্‌শাটি ভারী সুন্দর। সূর্যচ্ছটা। দরজা পেরিয়ে একফালি সযত্নলালিত কানন। মরসুমী নানান রকম ফুল ফুটে জায়গাটার শোভা বাড়িয়েছে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সুমিষ্ট গন্ধ। সামনে অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা। তারপর সামনে-পেছনে পর পর দুখানা ঘর। প্রথম ঘরটা হলঘরের মত। অনেক লোক এক সঙ্গে বসতে পারে।

হলঘরটা দেখিয়ে নরেশ বল্লেন—এই ঘরে চলবে?

দ্বিজেন বললেন—নিশ্চয়।

নরেশ গোটা বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে দেখালেন দ্বিজেনকে। পায়খানা, বাথরুম পর্যন্ত। দুজনে এসে হলঘরে বসলেন। অনেক আলোচনা হ'ল তাঁদের মধ্যে। প্রস্তাবিত মিউজিক এ্যাণ্ড ড্যান্স স্কুল সম্পর্কে। তারপর একসময় দ্বিজেন খুশীমনে বিদায় নিলেন। নরেশও মনের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনা নিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

স্নানাহার সেরে লম্বা ঘুম দিলেন নরেশ বেলা চারটে পর্যন্ত। সময়টা গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের প্রতাপটা এবার যেন একটু কম। সারা বোশেখ মাস জুড়ে যেন গ্রীষ্ম আর বর্ষা পরস্পরকে তাড়া ক'রে ফিরছে। দুপুরে রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছিল। এর ভেতর

কখন মেঘ হয়ে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। জানতে পারেন নি। জানলার বাইরে চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকলেন নরেশ। সেখানের মেদুরতা এখনো বিলীন নয়। দিগন্তে মেঘের ছায়ার স্পর্শটুকু লেগে আছে তখনো।

ঘুম ভাঙার পর থেকেই সেতারের একটানা সুমিষ্ট ঝঙ্কার নরেশের কানে এসে বাজছিল। উমা এসেছে। সুতপা সেতার শেখে তার কাছে। নরেশের ছোট মেয়ে। বড় মেয়ে সুব্রতার বিয়ে হয়ে গেছে মাস কয়েক আগে। একমাত্র ছেলে সুনির্মল বিলেত গেছে ডাক্তারী পড়তে। সুখী, সুন্দর পরিবার।

উমার বাহাদুরী আছে। সুতপা মাত্র কয়েক মাস শিখছে ওর কাছে। এরই মধ্যে হাতটা বেশ মিষ্টি হ'য়ে উঠেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন নরেশ। মুখ হাত ধুয়ে নিলেন। জামাকাপড় পরে তৈরি হলেন বেরুবার জন্যে। চাকর চা দিয়ে গেল। ঘাড়ে, মুখে বেশ ক'রে পাউডারের পাফ্‌টা বুলিয়ে নিলেন নরেশ। ধীরে ধীরে চাটা শেষ করলেন। তারপর যে ঘরে উমা সুতপাকে সেতার শেখাচ্ছিল, সোজা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উমার মুখ সামনে। সুতপা ব'সে আছে দরজার দিকে পিছন ফিরে। নরেশকে দেখে মুখে একটা মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে উমা বললো—আসুন।

নরেশ এগিয়ে গেলেন। একটা চেয়ার টেনে বসলেন উমার সামনে। সহাস্যে বললেন—দ্বিজেনবাবু এসেছিলেন উমা।

—কথাবার্তা হ'ল?

—হ্যাঁ হ'য়েছে।

—কবে থেকে খুলবেন ক্লাস?

—খুব শীগ্‌গীর। তুমিও থাকবে দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে কেমন?

—নিশ্চয়ই থাকব।

—ভেরি গুড। একটুখানি থেমে উমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে নরেশ বললেন—তোমাকে আর একটা কাজের ভার দেব উমা।

—বলুন।

—এখন নয়। সুতপাকে এখন ডিস্‌টার্ব ক'রে কাজ নেই। তুমি বরং যাওয়ার সময় আমার অফিস হয়ে যেও। কেমন?

—একটু ইতস্ততঃ ক'রে উমা বললো—আচ্ছা।

নরেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সোজা এসে বসলেন কারখানার অফিসে। অফিসে তাঁর পুরুষ কেরানীর সংখ্যা দুজন আর একজন মহিলা। তার ভেতর একটি আসন সপ্তাহখানেক আগে শূন্য হ'য়েছে। কেরানী পুলিনবাবু চাকরী ছেড়ে চলে গেছেন। নরেশকুমার তাঁর সঙ্গে নাকি অমানুষের মত ব্যবহার করেছেন। কারখানায় মজুরের সংখ্যা স্ত্রীপুরুষ মিলে চল্লিশের কম হবে না।

মহিলা কেরানীটির বয়স বছর কুড়ি-বাইশ হবে বোধ হয়। সাদামাটা দেখতে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। বেশ চটপটে।

চেয়ারে বসেই নরেশ বেল টিপলেন। তাঁর কামরা স্বতন্ত্র। বেল বাজতেই মহিলা কেরানীটি সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল। নরেশ হুকুম করলেন—ভারতী, কাছে এস।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে এগিয়ে গেল ভারতী।

খুশী খুশী মেজাজ নিয়ে বললেন নরেশ—ভারতী, এক্ষুণি আমাকে নয়নপুর যেতে হবে। মিউনিসিঁপালিটির মিটিংয়ে। কুমার সার্ভিসের বিলে কুড়ি লিটার পেট্রল লেখ। ড্রাইভারকে খবর দাও, গাড়ী বার করতে।

ভারতী নীরবে পেট্রোলের বিল লিখে নরেশের সামনে ধরলো। নরেশ সই করতে যাবেন এমন সময় বাইরে থেকে একটি ছোট্ট মেয়ের গলা শোনা গেল। নরেশ জিগ্যেস করলেন—কে?

ভারতী জবাব দিল—দেখে আসছি। বিলটা সই ক'রে দিন।

বিলটা নিয়ে ভারতী কামরা থেকে বেরিয়ে এল। সামনে একটি বছর দশেকের মেয়ে দাঁড়িয়ে। মুখখানা শুকনো। মাথায় এক রাশ রুক্ষ চুল। ভারতী দেখেই তাকে চিনল। পুলিনবাবুর মেয়ে অঞ্জু। কাছে গিয়ে ভারতী জিগ্যেস করল—কি খবর অঞ্জু?

—মা এসেছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবুর সঙ্গে দরকার। ডাকব মাকে ?

—ডাক

অঞ্জু বাইরে গেল। ভারতী বিলটা একজনের হাতে দিয়ে ড্রাইভারকে খবর পাঠাল। ইতিমধ্যে অঞ্জু মায়ের হাত ধ'রে ঢুকেছে। খুব রোগা চেহারা অঞ্জুর মায়ের। বয়স ত্রিশের নীচে। প্রচণ্ড অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে চলছেন, দেখলে বোঝা যায়। পরনের কাপড় ময়লা। জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। বাঁহাতে শাঁখা আর নোয়া, ডানহাতে শুধুই শাঁখা।

ভারতী জিগ্যেস করল—কি দরকার বলুন ?

—বাবু আছেন ?

—আছেন। ভেতরে আসুন।

ভারতী তাকে নিয়ে কামরার ভেতর গিয়ে ঢুকলো। নরেশ কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে ভারতীকে জিগ্যেস করলেন—কি চায় ?

অঞ্জুর মা জড়োসড়ো হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতীর পেছনে। সে-ই সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল—আমি এসেছিলাম অঞ্জুর বাবার মাইনের বাকী টাকা কটার জন্যে—

কথাটা শোনামাত্র দপ ক'রে যেন জ্বলে উঠলেন নরেশ। কপিশ রঙের চক্ষুতারকা দুটো থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসতে লাগল। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—ভারতী, ওকে বলে দাও, আমার কাছে ওর স্বামীর এক পয়সাও পাওনা নেই। যেতে বলো ওকে।

—অঞ্জুর বাবা বলছিল, ত্রিশ টাকা পাওনা আছে—

—না, আমি বলছি নেই। আমি কাজে ব্যস্ত, বেশী বকবার সময় নেই।

—অঞ্জুর বাবা শয্যাশায়ী। বাড়ীতে কেউ নেই। তাই আমাকেই আসতে হ'য়েছে। যদি এই দুঃসময়ে টাকা কটা—

—ভারতী, ব'লে দাও ওসব আবদার এখানে চলবে না।

নিরাশ হ'য়ে মেয়ের হাত ধ'রে মহিলা বিদায় নিলেন। নরেশ গজরাতে লাগলেন— হুঁঃ, প্রেষ্টিজ! প্রেষ্টিজে ঘা লেগেছে ব'লে চাকরী ছেড়ে দেওয়া হ'ল। এইবার বুঝুক ঠেলা। বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে মরুক না খেয়ে। ওকে এক পয়সাও পেমেণ্ট ক'রো না ভারতী।

ভারতী নিদারুণ বিতৃষ্ণা নিয়ে বেরিয়ে আসে কামরা থেকে। যন্ত্রচালিতের মতো গিয়ে বসে নিজের চেয়ারে। ভাবে, অহমিকা মানুষকে কতখানি নীচে নামিয়ে দেয়। ঐশ্বর্য মানুষকে কেমন অমানুষ ক'রে তোলে।

পুলিন বাবুর স্ত্রী এসেছিলেন স্বামীর নায্য পারিশ্রমিক নিতে। তারই সহকর্মীর স্ত্রী। এ ব্যাপারে কোন সাহায্যই সে করতে পারল না। নিরাশ হ'য়ে তাঁকে ফিরে যেতে হ'ল। মাত্র এক সপ্তাহ আগে এখানের কাজ ছেড়ে গেছেন পুলিনবাবু। মনিবের তিরস্কার সহ্য হয়নি তাঁর। আশী টাকার বিনিময়ে নিজেকে চাকর বাকরের সামিল ক'রে তুলতে তাঁব বিবেকে বেধেছিল। কদিন আগে এসেছিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান আর কমিশনাররা। তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে নরেশ হুকুম করলেন—পুলিন, পান, সিগারেট চা নিয়ে এসো দোকান থেকে। এনে দাও এঁদের।

পুলিনবাবু ইতস্ততঃ করে জবাব দিয়েছিলেন—আপনার চাকর বাকরদের বললে হয় না? তারা এনে দিত।

মাননীয় অতিথিদের সামনে তাঁরই একজন বেতনভুক কর্মচারীর কাছ থেকে এই উত্তর শুনে রাগে ফেটে পড়লেন নরেশ। বললেন চীৎকার ক'রে—যা বলছি কর, নইলে জুতোপেটা করবো।

আশী টাকার চাকরীর মায়া এযুগে ছাড়া প্রায় দুঃসাধ্য। সেই দুঃসাধ্য কাজই ক'রে গেলেন পুলিনবাবু। যাবার আগে ব'লে গেলেন—এর চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়াও অনেক সম্মানের।

ভারতী ব'সে ব'সে ভাবছিল, কথাটা মিথ্যে নয়। মনিব কি তাকেও অপমান করছেন না? পৌরসভার কমিশনার। ধনী ব্যবসায়ী। কত অর্থ, যশ, মান, প্রতিপত্তি! তবু এত ছোট কেন।

এই যে প্রতারণা করলেন পুলিন বাবুর স্ত্রীকে, এটা কি ওঁর পক্ষে করা উচিত হ'য়েছে? কত জায়গায় তো দান করেন। সামান্য ত্রিশ টাকা দিলে কি তিনি ফতুর হ'য়ে যেতেন? মানুষ এমন কেন হয়?

ভারতীর ভাবনায় বাধা পড়ল। অফিস রুমের ভেতর এসে ঢুকল উমা। ভারতীর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে সোজা সে গিয়ে ঢুকলো কামরার ভেতর। নরেশ অর্ডারের কাগজপত্রগুলোয় চোখ বুলুচ্ছিলেন। সেগুলোয় চোখ রেখে বললেন—বস উমা, হাতের কাজটা সেরে নিই।

উমা সামনের চেয়ারে বসল। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল—আমার কিন্তু বসলে চলবে না।

নরেশ কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে জিগ্যেস করলেন—কেন, কোথাও যাবে নাকি?

—হ্যাঁ। আর একটা টুইশানি আছে। ট্রেনের সময় হ'ল, নৈহাটী যেতে হবে। কি বলবেন বলছিলেন—

—ও, তুমি এখন নৈহাটী যাবে? ভালই হ'ল। আমি ড্রাইভারকে গাড়ী বার ক'রতে বলে দিয়েছি। আমার ওদিকে কাজ আছে। চল, বেরুই তা'হলে।

উমা আপত্তি জানাল। কিন্তু নরেশের প্রবল ইচ্ছার জোরে তা ভেসে গেল বানের তোড়ে ভেসে যাওয়া কুটোর মত।

ড্রাইভার গাড়ী গ্যারেজ থেকে বের ক'রে অফিসের সামনে এনে দাঁড় করাল। উমাকে নিয়ে নরেশ গিয়ে বসলেন গাড়ীতে। একেবারে একপাশ ঘেঁসে বসেছিল উমা। নরেশ বয়সে প্রবীণ হলেও কেমন যেন মন খুঁত খুঁত করছিল তার। কি বলবেন উনি।

আর কেনই বা গাড়ীতে ক'রে তাকে ট্রিপ দিচ্ছেন কে জানে অজানা কি এক ভয়ে বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল উমার।

পাওয়ার হাউসটা পার হ'তেই নরেশ একেবারে উমার গা ঘেঁষে বসলেন। একটু সরে বসবার চেষ্টা করল উমা। বৃথা চেষ্টা। তার পথ নিজেই বন্ধ ক'রে রেখেছে সে। নরেশকে ঘেঁষাঘেষি ক'রে বসতে দেখে কেমন যেন জড়োসড়ো হ'য়ে গেল উমা।

নরেশ আরও বাড়াবাড়ি করলেন। উমার ঘাড়ের পাশ দিয়ে হাতটা মেলে দিলেন। তার প্রায় মুখের কাছে মুখ এনে বললেন—ইলেকসান্ সামনে। এখন থেকেই তোমাকে একটা কাজের ভার দোব।

সারা শরীরটা ঘিন ঘিন ক'রে উঠল উমার। একবার মনে হ'ল, ঘাড়ের পাশ থেকে ওঁর হাতটা সরিয়ে দেয়। কিংবা বলে, একটু সরে বসুন। কিন্তু কিছুই সে করতে পারলো না।

প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে সে শুনতে লাগল, নরেশ ব'লে চলেছেন—তোমাকে বাড়ী বাড়ী এখন থেকেই ক্যানভাস করতে হবে উমা। অনেক বাড়ীতেই তোমার যাওয়া আসা আছে। এবার মেয়ে ভোটারের সংখ্যা পুরুষদের চেয়েও বেশী। তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে, আর তিন বছর আমাকে পাঠালে গ্রামের চেহারা বদলে যাবে। ওয়াটার পাম্প বসান হবে, চিলড্রেন পার্ক তৈরী হবে, মেটারনিটি হোম গ'ড়ে তোলা হবে আমাদের ওয়ার্ডে। হেঁজিপেঁজি লোককে পাঠালে সরকারের কাছ থেকে টাকা বের করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। কাজেই—

অনেকক্ষণ একটানা কথা ব'লে থামলেন নরেশ। নয়নপুর পৌরসভার সামনে গাড়ী থামতে তাঁর কথা থামল। নেমে গেলেন তিনি। ড্রাইভারকে ব'লে দিলেন, উমাকে নৈহাটী পৌঁছে দিয়ে তাঁকে তুলে নিতে এখান থেকে।

গাড়ীটা ছাড়তে স্বস্তি বোধ করল উমা। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৈহাটী গিয়ে পৌঁছল।

॥ তিন ॥

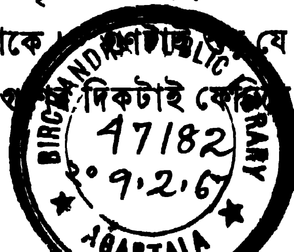
বড়বাড়ীর আলোবাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে একখানি ঘর। চুনবালি খসা দেওয়াল। ক্ষয়রোগগ্রস্ত রুগীর হাড় পাঁজরার মতো স্থানে স্থানে ইঁট বেরিয়ে আছে।

অরুণার অবস্থাও এই ঘরখানার মত। দেহে কোথায় যেন ঘুণ ধরেছে তার। নিঃশ্বাস নিতে পারে না ফুসফুস ভরে।

দেহের সেই সতেজ সৌন্দর্য ভোজবাজির মত কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। ভরা যৌবন নিয়ে যথেচ্ছ দাপাদাপি স্থুরু করেছিল অরুণা; বড়বাড়ীর লৌহ-অবরোধ ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সে। সমস্ত কিছু বাধা নিষেধের গণ্ডী তেজ আর দুর্দম সাহসের সঙ্গে পার হ'য়ে এসেছে। অরুণা যেন এক কঠোর শপথ নিয়ে এসেছিল বড়বাড়ীর ভেতর। ভেঙ্গে সব তছনছ করবে সে। আপন ইচ্ছেমত চলবে। ভ্রূক্ষেপ করবে না তার আচরণের জন্যে কে কোথায় কানাকানি করছে।

দেহ শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করল অরুণার সঙ্গে। হিংস্র জীবাণু আশ্রয় নিল তার দেহে। অরুণার বাইশ বছরের উদ্ধত যৌবন যেন চুপসে গেল। কেন এমন হ'ল তার? ক্ষয়রোগ? এই ক্ষয়রোগের জীবাণু তার দেহে প্রবেশ করল কি করে? সেটা যখন সে জানতে পারল তখন সাবধান হবার সময় পেরিয়ে গেছে।

অরুণা এজন্য দায়ী করে সুধীরকে। অমরের সঙ্গে সেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, দেবানন্দপুরে। সুধীরের সঙ্গে অরুণা গিয়েছিল শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসবে। অনেক বড় বড় সাহিত্যিক, পণ্ডিত এসে-ছিলেন সেবার। অমরও বক্তৃতা দিয়েছিল। তার বক্তৃতাই সব চেয়ে মুগ্ধ ক'রেছিল অরুণাকে। [illegible] যে দেখে, সে যথার্থ বিচার করতে পারে না। [illegible] দিকটাই [illegible] ফেনিয়ে সমাগত



সুধীজনেরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন অপরাজেয় কথা-শিল্পীকে। শুনে মন ভরেনি অরুণার। সে ক্ষোভ মিটিয়ে দিল অমর। তার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী তুলাদণ্ডে দোষ গুণের পাল্লা রইল সমান সমান। সকলের থেকে তার বক্তব্য পৃথক। তার স্বাদও তাই আলাদা।

সুধীরের সঙ্গে অমরের ঘনিষ্ঠতা বহুদিনের। নারাণপুর স্কুলের সহকারী শিক্ষক অমর। মাঝে মধ্যে ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠানে আসত সে। তারপর থেকে সে ঘন ঘন আসতে সুরু করল বড়বাড়ীর স্যাঁতসেঁতে ঘরটিতে। অরুণাই তাকে আসবার জন্যে অনুরোধ করেছিল। শেষে অরুণা রীতিমত ছাত্রী হ'য়ে উঠল তার। প্রথম সাক্ষা'তেই সে বুঝেছিল, মানুষটা তোতাপাখী নয়। তাঁর চিন্তার ভেতর মৌলিকতা আছে। এমন মানুষের কাছ থেকেই পাঠ নিতে হবে তাকে। তবেই তা সার্থক হবে।

আজকের অরুণা আর দেড় বছর আগের অরুণাতে তফাৎ অনেক। দেহে তার ক্ষয় রোগ। ডাক্তারের নির্দেশ, সম্পূর্ণ বিশ্রাম, নিয়মিত ওষুধ আর পথ্য। এ সব দিকে কড়া নজর অমরের। এতটুকু এদিক ওদিক হবার যো নেই।

প্রথম যেদিন এ বাড়ীতে অমর আসে, সে দিনটির কথা মনে পড়ে অরুণার। সেই পড়াশুনো কেমন হ'চ্ছে জিগ্যেস করল তাকে। মাষ্টারের জাত। সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারী সুরু হ'য়ে গেল। টেবিল থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে এটা সেটা প্রশ্ন করতে লাগল অমর। সুধীরও ছিল ঘরে। অরুণাকে বলতে হয়নি মুখ ফুটে। সুধীরই বললো—অরুণা এবার ইন্টারমিডিয়েট দেবে। আপনার সাহায্য পেলে ভালই হবে ওর।

অমর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অরুণার পানে। অরুণা সাধ্যমতো সেদিন মিনতি ফুটিয়েছিল চোখে। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল অমর।

তারপর ফার্ষ্ট ডিভিসানে পাশ করে অরুণা। অরুণা অস্বীকার করে না, এর মূলে ছিল অমরের অক্লান্ত পরিশ্রম। বিনা

পারিশ্রমিকে সে দিনের পর দিন তাকে পড়িয়ে গেছে। ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে সে প্রত্যহ এসেছে নারাণপুর থেকে।

অরুণা জানত না, অমরের বুকে ক্ষয়রোগের বাসা। জানলে নিজের সর্বনাশ সে কখনই ডেকে আনত না এমন ক'রে।

যেদিন তার পাশের খবর বার হ'ল, সেদিন প্রথম অমরই খবর নিয়ে ছুটে এসেছিল। ভয়ানক খুশী হয়েছিল সে। আনন্দের উত্তেজনায় বোধ হয় তার ইচ্ছে হচ্ছিল অরুণাকে চেপে ধরে বুকে। অরুণা যেন তার মনের কথা টের পেয়েছিল সেদিন।

অরুণার মা মিষ্টি আনিয়ে খাওয়ালেন অমরকে। ডিসে ক'রে নিজেদের গাছের আম কেটে দিলেন। অনেকক্ষণ সেদিন ছিল অমর। অরুণার কলেজে ভর্ত্তি হবার ব্যাপার নিয়ে কথাবার্ত্তা বলল অরুণার মায়ের সঙ্গে। অনেক রাত্রে সেদিন ফিরেছিল সে।

অরুণা গলিটায় তাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। ঘুটঘুটে অন্ধকার গলি। দিনের বেলাতেও এর ভেতর আলো ঢোকে না। এখানের পায়ের নীচের মাটিও তাই স্যাঁতসেঁতে। বর্ষায় কাদা। একটা ছুঁচোর গায়ে বোধ হয় পা পড়েছিল অরুণার। কিঁচ কিঁচ শব্দ করতে করতে সেটা ছুটে পালাল। ভয়ে অরুণা অমরের একটা হাত ধ'রে ফেলল শক্ত ক'রে।

অমরের মুঠোর মধ্যে অরুণার হাতখানা উত্তেজনায় কাঁপছে ঠক ঠক ক'রে। একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়াল সে। তার সুপুষ্ট স্তনের স্পর্শ লাগছে অমরের গায়ে। অরুণার মনে হল, সারা শরীরটা শির শির ক'রে উঠল তার। চোখ দুটো জ্বল জ্বল ক'রে উঠল। শিকার দেখলে শ্বাপদের চক্ষু যেমন জ্বলে। অরুণার পরিস্ফুট যৌবনের ওপরও তার প্রেমিকের দৃষ্টি তেমনি সুযোগ বুঝে লোলুপ হ'য়ে উঠল।

এই মুহূর্ত্তে গলিটায় কারও [illegible]জানার সম্ভাবনা নেই। থাকলেও তার পায়ের [illegible] সাবধান হ'তে [illegible]এক মুহূর্ত্ত [illegible] লাগবে না।

ইচ্ছে করেই অরুণা হাতখানা ছাড়িয়ে নেয়নি। শক্ত মুঠোয় অমরের হাতখানা আঁকড়ে রইল। সেদিন অমর বোধ হয় ভেবেছিল, এ তার আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত।

নিশ্চয় তাই ভেবেছিল অমর। অনুমতি চাইবার প্রয়োজন মনে করেনি অরুণার কাছে। অরুণার নরম দেহটা বুকে টেনে নিয়ে পিষে ফেলেছিল। মুখে মুখ দিতে চায়নি প্রথমে। অরুণাই তুলে ধরেছিল মুখখানা একেবারে ওর মুখের কাছে।

সে আজ থেকে বছর দেড়েক আগের ঘটনা। তার স্মৃতি আজ কেমন যেন পীড়া দেয় অরুণাকে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল অরুণা। পশ্চিমের জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে দিল সে। পাশেই রেললাইন। ঝক্ ঝক্ শব্দ ক'রে একখানা ট্রেন চলে গেল গোটা বড়বাড়ীখানাকে কাঁপিয়ে। রেললাইনের ওপাশে খানকতক বাড়ীর পরে বি. টি. রোডের ধারে পাওয়ার হাউস। বিরাট বিরাট চিমনিগুলো যেন আকাশটা ছোঁব ছোঁব করছে। হুগলী নদীর ভিজে বাতাস হু হু ক'রে ছুটে আসছে এদিকে। বড়বাড়ীর দেওয়ালে প্রতিহত হ'য়ে ছুটোছুটি করছে এধার ওধার।

প্রথমে অরুণা বুঝতে পারেনি, তার কী হয়েছে। কেন এমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে সে। বুকের ভেতরটা বেদনায় টন টন ক'রে ওঠে মাঝে মাঝে। খুক্ খুক ক'রে কাশে। অমরকে জানিয়েছিল একথা। শুনে মুখখানা ফ্যাকাসে হ'য়ে গিয়েছিল অমরের। এখন অরুণা বুঝতে পারে, কেন এমন হয়েছিল। সেদিন কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চায়নি অমর। অরুণার চিকিৎসার ভার নিজেই সে নিয়েছে। অরুণার দাদারা যে যাঁর সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মাষ্টারের সঙ্গে অরুণার মেলামেশা নিয়ে তাঁরা কোনদিন মাথা ঘামাননি। তার রোগের কথা শুনেও তাঁদের উদাসীনতা তেমনি অবিচল রইল।

রোগের কথা জেনে অরুণা জিগ্যেস করেছিল অমরকে—কি হবে?

অমর বলেছিল—সেরে গিয়েছিলাম বলেই জানতাম অরুণা। এখন দেখছি সে ধারণা ভুল। তোমার রোগের জন্যে দায়ী আমি। ভেবোনা অরুণা, কিছু ভেবোনা তুমি। তোমাকে সারিয়ে তুলবোই। এ দায়িত্ব আমার নিজের। নিশ্চয়ই তুমি সেরে উঠবে।

ম্লানমুখে জিগ্যেস করেছিল অরুণা—তারপর ?

—তারপর আবার কি ? তার আর পর নেই। আমাদের বিয়ের উৎসবটুকু ছাড়া।

অরুণার শীর্ণ মুখখানায় সামান্য রক্তের আভাস দেখা গিয়েছিল। ওর একখানা হাত তুলে নিয়ে অমর বলেছিল—ভেঙ্গে পড়োনা অরুণা। এ বছরটা সম্পূর্ণ বিশ্রাম করো। আসছে বছর পড়াশুনা আবার সুরু করবে। ঘোরাঘুরি করোনা বেশী। ওষুধের চেয়ে এ রোগে দরকার বিশ্রাম।

অরুণা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল—আর আপনি ? আপনার বুঝি বিশ্রাম নেবার দরকার নেই ?

—আমি তো টিউশ্নিনি সব ছেড়ে দিয়েছি। স্কুলে যাই। জানোত, স্কুল হ'ল শিক্ষকদের বিশ্রামাগার। ব'লে সশব্দে হেসে উঠল অমর।

হেসে অরুণা বলল—আপনার কথাগুলো বড় স্পষ্ট। অন্য কোন শিক্ষকের মুখ থেকে স্কুল সম্পর্কে এমন কথা শুনতে পাবো না।

—স্পষ্ট কথাই আমি বলে থাকি। এই জন্যেই আমি কারো কাছে প্রিয় হতে পারলাম না।

—আমি কিন্তু এই জন্যেই আপনাকে শ্রদ্ধা করি।

—তা করতে পারো। ভালবাসা শ্রদ্ধারই অনুগামী। এ সবে অবিচলিত থাকলেই হ'ল।

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে। জানালার দিকে মুখ ক'রে শুয়েছিল অরুণা। নির্জন অবসরে অতীতদিনের স্মৃতিগুলো [illegible] ভেসে উঠছিল মনের পটে। একবার সে পা[illegible] ফিরে [illegible]

দিনরাত্রি শুয়ে কাটাতে অসহ্য মনে হয় তার। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে এ বাড়ী সে বাড়ী। বন্ধুরা তার রোগের কথা জানে বলে কাছে ঘেঁষে না। দূরত্ব বজায় রেখে তারা কথা বলে। কখনও কখনও অরুণা ভুলে যায় নিজের রোগের কথা। তাদের কাছে এগিয়ে যায়। বন্ধুরা সরে গেলে হুঁস হয় অরুণার। এজন্যে কোনো ক্ষোভ নেই তার মনে।

ইদানীং অরুণাকে প্রায়ই বেরুতে হয় আর একটা কারণে। নয়নপুর পৌরসভার নির্বাচন আসন্ন। সুধীর তাকে গুরুদায়িত্ব দিয়ে বসেছে। ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লকের প্রার্থীদের হ'য়ে বাড়ী বাড়ী ক্যানভাস করতে হবে। বহু মহিলা ভোটার আছে। তাদের গিয়ে বোঝাতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী পৌরসভার কর্তৃত্ব নিজেদের কুক্ষিগত ক'রে রেখেছে। দুর্নীতিতে ভ'রে গেছে। পৌরসভার আয় কোন্ নালা দিয়ে বর্ষার জলের মত ব'য়ে যাচ্ছে, কে জানে। এই দুষ্ট শাসকচক্রকে অপসারিত ক'রে ইউ. পি. বি. প্রার্থীদের হাতে কর্তৃত্বভার দিতে হবে। প্রগতিশীল চিন্তার দ্বারা সেই সব প্রার্থীরা পৌরসভাকে দুর্নীতিমুক্ত করবেন। পৌর-এলাকার অধিবাসীদের জীবন ধারণের মান উন্নয়নের জন্যে যা যা করা দরকার, তার প্রতিশ্রুতিই শুধু নয়। হাতে নাতে তা প্রমাণ ক'রে দেবার জন্যে আটটি ওয়ার্ডের ইউ. পি. বি. প্রার্থীরা অনলস পরিশ্রম ক'রে চলেছে।

এই সব কথা অরুণাকে বাড়ী বাড়ী ব'লে বেড়াতে হবে। নিয়মিত ওষুধ, পথ্য আর বিশ্রামের ফলে অরুণা এখন পূর্বের তুলনায় অনেকখানি সুস্থ। নিরুপায় হ'য়ে সুধীর তার শরণাপন্ন হ'য়েছে। ক্যানভাসের গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে তার ঘাড়ে। সুধীরও একজন প্রার্থী। নির্বাচনের সাংগঠনিক কাজে অরুণার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। অরুণা সুধীরের প্রস্তাব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। প্রশ্ন করল—আমাদের ওয়ার্ডের চারটি আসনেই তোমরা প্রার্থী দিচ্ছ ?

সুধীর দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল—নিশ্চয়।

—তা'হলে তোমাদের ইলেক্‌সানের নারীকর্মীদের ভেতর আমি ছাড়া আর কজনের নাম করো দেখি।

—আপাততঃ আমাদের সংগঠনের দ্বিতীয় নারীকর্মীর নামটা দিতে পারছি না। তবে এই এলাকারই একজন প্রতিক্রিয়াশীল পুরনো কমিশনারের এক মহিলা নির্বাচন কর্মীর নাম করতে পারি।

—তাই নাকি, প্রতিক্রিয়াশীলরা নারীকর্মী কাজে নামিয়েছে? ওরা তা'হলে তোমাদের চেয়েও প্রগ্রেসিভ দেখ্‌ছি। হাসতে হাসতে বললো অরুণা। আচ্ছা সেই মেয়েটি কে বল দেখি?

—উমা।

—উমা? ও রাজনীতিতে নেমেছে সেতার ছেড়ে?

—নরেশকাকার সেইটুকুই বাহাদুরি। উমা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ক্যানভাস করছে তাঁর হ'য়ে। আমিও দেখিয়ে দোব, আমাদের সংগঠন কাকে বলে। আমাদের ওয়ার্ডে পুরুষ ভলান্টিয়ার আমরা যোগাড় করেছি চল্লিশের কাছাকাছি। মহিলা কর্মী হিসেবে তুমিই অদ্বিতীয়া। তবে আশা করছি, এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমাকে ডজন খানেক মেয়ে কর্মীর নাম দিতে পারব। আপাততঃ উমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হিসেবে কাজ করতে হবে তোমাকে।

—কিন্তু অমরদা যে আমায় বেরুতে মানা করেছে ভাই।

—গুলি মারো তার কথায়। ইলেকসানে আমাদের জিতিয়ে দিয়ে যদি তুমি মরো, আমরা তা'হলে তোমার পাথরের মূর্তি গড়িয়ে—

—থাক, থাক, পাগলের মত কথা ব'লো না।

—না, মাইরি বলছি।

—মূর্তি তৈরি করার টাকা পাবে কোথায়? পৌরসভার তহবিল থেকে নিলে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ থাকবে কি শুনি?

—তা কেন, আমরা চাঁদা তুলে—

—আচ্ছা, আচ্ছা বুঝেছি, তোমাদের দৌড় যে কত, তা আমার জানতে বাকী নেই। তাই হবে। আমার সাধ্যে যতখানি কুলোবে, করে দোব। কিন্তু একথা অমরদার কানে না যায়। ও আবার বাড়াবাড়ী করে বসবে। জানতো, আমার চিকিৎসার জন্যে জলের মত কী পয়সাটাই না খরচ করছে।

সুধীর সহাস্যে বলেছিল—করতেই হবে। অমর প্রগ্রেসিভ, তাই করছে। কোন প্রতিক্রিয়াশীল হ'লে তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে নির্ঘাত পালাত। অরুণা হেসে উঠেছিল সুধীরের কথা শুনে।

এও কদিন আগেকাব কথা। শুয়ে শুয়ে মনে মনে সেই সব কথা নাড়া চাড়া করছিল অবণা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'তে চলল। শাঁখ বেজে উঠল। ঘরে ঘরে আঁচ দেওয়া হয়েছে। চারদিক ধোঁয়ায় অন্ধকার। বিছানায় আর শুয়ে থাকা যায় না। উঠে পড়ল অরুণা। সোজা বাথরুমে গেল। মুখ হাতে সাবান দিয়ে নিলে। কাপড়-চোপড় বদলে হালকা প্রসাধন ক'বে নিল তাড়াতাড়ি। রুক্ষ চুলগুলোয় বার কতক চিরুণী বুলিয়ে নিল। কাঁটায় কাঁটায় সাতটা বেজেছে ঘড়িটায়। খানিক আগে অরুণার মা ঘরে সন্ধ্যা দেখিয়ে গেছেন। ধূপকাঠি জ্বলছে কুলুঙ্গির ধূপদানীটায়। ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরখানিতে।

অরুণার মা এক গ্লাস দুধ হাতে ক'রে ঘরে ঢুকলেন। অরুণাকে সাজ-গোজ করতে দেখেই বুঝতে পেরেছেন, কোথাও বেরুবে। বললেন—অসুস্থ শরীর নিয়ে রোজ রোজ বেরনো ঠিক হ'চ্ছে না অরুণা!

—এর চেয়ে আর অসুস্থ হবো না মা। তাছাড়া একটু নড়াচড়া করা ভালো।

—দুধটুকু খেয়ে নে।

অরুণা মার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে অল্প চুমুক দিল।

—কোথায় চললি আবাব এখন?

—সুধীরদার হুকুম। মিটিং আছে, যেতে হবে আমাকে।

—অ, সুধীর যেতে বলেছে। ঐ ভোটের জন্য বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় হবে মিটিং ?

—পূজোর দালানে।

—তাই বল্। তা যা, তবে অমর এলে চলে আসিস বাছা। ও পই পই ক'রে আমাকে বলে গেছে, তোকে যেন বাড়ীর বার হ'তে না দিই।

—আচ্ছা মা, চল্লাম। মিটিংয়ের সময় হ'য়ে গেছে। গ্লাসের দুধটা শেষ ক'রে টেবিলের নীচে একপাশে নামিয়ে রেখে দিল অরুণা। তারপর বেরিয়ে পড়লো।

গলিটার মধ্যে পড়েই বুকখানা কেমন দুলে উঠল তার। এই গলির জমাট অন্ধকার তাদের মন দেওয়া নেওয়ার সাক্ষী হ'য়ে থাকবে না চিরকাল। বড়বাড়ী ধূলিসাৎ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই গলির অন্ধকারও একদিন নিশ্চিহ্ন হবে। বড়বাড়ীর ভগ্নস্তূপ সরিয়ে সেদিন এখানে তৈরী হবে নতুন ইমারত।. বড়বাড়ী আর তার অন্ধকার গলির মতো অরুণার অনিশ্চিত জীবনটাও সেদিন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। সেদিনের নতুন ইমারতের কক্ষে কক্ষে আলোর রোশনাই-এর মতো তার জীবন আলোকিত হ'য়ে উঠবে না।

দ্রুতপায়ে গলিটা পার হ'যে সামনের বিরাট আঙিনায় এসে যেন হাঁফছেড়ে বাঁচল অরুণা। ডাইনে কয়েকটা সিড়ি বেয়ে উঠলো পূজোর দালানে। অনেকেই এসে জুটেছে সেখানে। ইউ. পি.-বির কেন্দ্রীয় অফিস ভাটপাড়ায়। সেখান থেকে দু'চারজন কর্মকর্তা এসেছেন। আটনম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থীরা সকলেই উপস্থিত। স্বেচ্ছা-সেবকের সংখ্যাও কম পক্ষে ত্রিশ জনের মত। অরুণা গিয়ে এক পাশে বসল। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে।

নির্বাচনের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে এই সভা। সভাপতিত্ব

করছিলেন ইউ. পি. বির অন্যতম প্রার্থী অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর মৈত্র। সভার ঠিক মাঝখানে তিনি বসেছিলেন। খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ঈষৎ স্থূল চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে। মুখখানিতে সরলতা মাখানো। ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বল চোখ দুটিতে বুদ্ধির ছাপ আছে, কিন্তু তা প্রখর মনে হয় না। বয়স তিরিশের বেশী নয়। রাজনীতির ঘোর প্যাঁচ তিনি ভাল বোঝেন না। তাঁর অতি সরল নীতি-ঘেঁসা কথাবার্তায় সেকথা বোঝা যায়। অতিমাত্রায় ভাববাদী মানুষ শশাঙ্কশেখর। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি খুবই বেমানান। প্রথম থেকেই একথা মনে হয়েছিল অরুণার।

সুধীরের মুখে যেদিন প্রথম শুনল অরুণা, শশাঙ্কশেখর একজন ক্যানডিডেট্, সেদিন সে স্পষ্টই বলে ফেলল—তোমরা ভুল করছ সুধীরদা।

অবাক হ'য়ে সুধীর তাকিয়েছিল অরুণার মুখের দিকে। বড়বাড়ীর ডালপালা বিস্তৃত সম্পর্কের হিসাবে তাদের ভেতর ভাই বোন সম্বন্ধ। প্রায় সমবয়সী ব'লে তাদের ভেতর বন্ধুত্বের সম্পর্কই বেশী ব'লে বোধ হয়। সমাজ-কর্মী হিসেবে সুধীরের যে এত নামডাক, সে ঢাক অরুণাই বহুক্ষেত্রে পিটিয়ে বেরিয়েছে। কী স্কুলের, কী লাইব্রেরীর, কী পার্টির নির্বাচনে। সুধীর তাই সমস্ত বিষয়ে অরুণার পরামর্শ নিত। তার সাহায্য প্রার্থী হত যখন তখন। অরুণা কোনো সময়েই তাকে নিরাশ করেনি।

অরুণার কথা শুনে অবাক হল সুধীর। প্রশ্ন করল—কেন?

—লোকে মনে করবে, শশাঙ্কদাকে দলে ভেড়ানোর অর্থ হ'ল, তাঁকে ভাঙিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া। তাই নয়?

—তোমার কথার পেছনে যুক্তি আছে, অস্বীকার করিনা অরুণা। কিন্তু আমাদের সংগঠনে সৎলোকই ত আমরা চাই। আমার মনে হয়, শশাঙ্কদা যে রকম জনপ্রিয় আর সৎ, তাতে ক'রে লোকে অন্ততঃ এইটুকু বুঝবে আমাদের কর্মপন্থায় জনসাধারণের মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না।

—অন্যদিক থেকে এর ফলাফলের কথা ভাবছো না কেন সুধীরদা। এখানের মানুষের অচলায়তন সংস্কার ভাঙবে না কিছুতেই। কত লোককে বলতে শুনেছি, যে খুশী দাঁড়াক, ভোট আমরা নরেশ বাঁড়ুয্যেকেই দেব। সেখানে ওই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জোটে শশাঙ্কদার মত নিরীহ, সরল মানুষ হেরে যান যদি, তখন কি সেই সত্যই স্পষ্ট হবে না?

—কোনো বিলাসিতার মোহে আমরা মানুষের সেবা করতে এগিয়ে আসিনি অরুণা। অন্তরের ভেতর থেকে একটা নেশা যেন আমাদিকে এই কাজে ঠেলে দিচ্ছে। প্রাণ দিয়ে যাদের সেবা করি, তাদের এতটা ভুল বুঝতে চাই না। না, তা হ'তেই পারেনা, জয় আমাদের নিশ্চিত।

ওর আশায় ভরা উজ্জ্বল মুখখানার দিকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অরুণা।

সেই শশাঙ্কশেখর। আজকের সভাপতি। সুমিষ্টকণ্ঠে তিনি একে একে প্রত্যেককে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে তাঁদের বক্তব্য জানাতে অনুরোধ জানালেন। সকলের বক্তব্যই নোট করা হচ্ছিল। শশাঙ্কশেখর এক সময় অরুণার নাম ঘোষণা করলেন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল অরুণা। প্রথমটায় সামান্য সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। বলতে আরম্ভ ক'রে সঙ্কোচ দূর হ'য়ে গেল। স্বর ক্রমশঃ চড়ছিল অরুণার। তার প্রত্যেকটি মূল্যবান যুক্তি উপস্থিত সকলেই গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

বলতে বলতে হাঁপাচ্ছিল অরুণা। মাঝে মাঝে খুক্ খুক্ ক'রে কাশতে হচ্ছিল তাকে। কাশি সামলে নিয়ে আবার সে বক্তব্যের জের টেনে যাচ্ছিল। অরুণা বলতে জানে। জ্বালাময়ী ভাষায় বলে যাচ্ছিল সে। শশাঙ্কশেখর মাথা নীচু ক'রে শুনছিলেন। সতরঞ্চের একটা সুতো নিয়ে ছেলেমানুষের মত টানাটানি করছিলেন। আর ভাবছিলেন, অরুণার মত এমন যুক্তি দিয়ে কথা বলতে তিনিও তো জানেন না।

এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত হ'ল হঠাৎ। অরুণার বক্তৃতার মাঝখানে সভার মধ্যে ধূমকেতুর মত অমরের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে অরুণার কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

যে পর্দায় উঠে অরুণার স্বর হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল, তার এক ধাপ উঁচু পর্দায় শোনা গেল অমরের আওয়াজ। সভার সকলেই তার চীৎকারে চমকে উঠল। অমর তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

অরুণার দিকে তর্জনী তুলে সে চিৎকার ক'রে বলল—কেন তুমি এসেছ ঘর ছেড়ে? কে এখানে আসতে অনুমতি দিয়েছে তোমাকে? দিনরাত আমি তোমার জন্যে ভেবে মরছি। হাজার বার সাবধান ক'রে দিয়েছি। তবু আমার কথা কানে তুলছ না কেন? এ রকম অবাধ্যতার অর্থ কী? আমার কথা যদি নাই শোনো, তা'হলে আমি মিছামিছি তোমার পেছনে পয়সা খরচ ক'রে মরি কেন? ওষুধ রে, পথ্য রে, কি বাদ রেখেছি আমি? তার জন্যে এ কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত নেই। একে কী বলে? আমি এ সব করব না বুঝেছ? চলে এস—কাম্ অন্, আই সে—ষ্টুপিড্, নন্‌সেন্স—

স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন শশাঙ্কশেখর। মনে হল, তাঁর অমর যেন সভার মধ্যে দুঃশাসনের মতো বস্ত্র হরণ করছে দ্রৌপদীর। লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে অরুণার মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে। বোধ হয়, আশা করছে, কেউ হয়ত তাকে বাঁচাবে এ অপমান থেকে।

কিন্তু বজ্রাহত সভার সবাই নিঃস্তব্ধ। মাথা নীচু ক'রে ব'সে। সকলেই বিরক্ত হয়েছে অমরের ব্যবহারে। কিন্তু ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলতে সাহস করেনি কেউ। সবাই বুঝি আশা করছিল, অরুণা এক ঘর লোকের সামনে এ অপমান কিছুতেই হজম করবে না। এই মুহূর্তে সে পদদলিতা ভুজঙ্গিনীর মতো গর্জে উঠবে।

অমর তখনো চীৎকার ক'রে চলেছে[illegible]য় অর, আই সে—অরুণা সবাইকে অবাক ক'রে দিল আবার। কোনও প্রতিবাদ না ক'রে বেরিয়ে গেল মাথা নীচু ক'রে। অমবের দৃষ্টিতে ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে যেন আগুন জ্বলছিল। পেছন থেকে যেন অরুণাকে দগ্ধ করতে করতে সেও বেরিয়ে গেল।

সকলে তখন এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে।

॥ চার ॥

মহাসমারোহে মিউজিক এণ্ড ড্যান্স স্কুলের প্রতিষ্ঠা হ'লো।

নরেশ সব ব্যাপারেই একটু জাঁকজমক পছন্দ করেন। তাবৎ ধনী লোকের সঙ্গে এই জায়গায় তাঁর কোন অমিল নেই। একটু বেশী মাত্রায় খামখেয়ালী তিনি। খেয়াল চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মনে স্বস্তি নেই। এতে কেউ বাধা হ'য়ে দাঁড়ালে তাকে উচিত শিক্ষা দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। গ্রামের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-গুলিতে তাঁর দান উপেক্ষা করার মত নয়। কিন্তু যখনই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো ব্যাপাবে তাঁর মতান্তর হ'য়েছে তখনি তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তখন থেকেই সেই প্রতিষ্ঠানটী তাঁর বিষনজরে পড়ে গেছে।

মিউজিক স্কুলের কথা আলাদা। এখানে তিনিই সর্বেসর্বা। যেমন তাঁর খুশী, নিজের খেয়াল সেইভাবেই মেটাবেন। কারও পরামর্শ নেবার দরকারই করে না।

মনে মনে উৎসবের একটা পরিকল্পনা ঠিক ক'রে নিলেন নরেশ। দ্বিজেন আর উমার কাছে সেটা পেশ করলেন। অনুমোদনের জন্য নয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্যে।

দু'দিন ধরে উৎসব হবে। আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান সূচীর পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রথম দিন নৃত্যনাট্য ও কণ্ঠসঙ্গীত। দ্বিতীয় দিনে যন্ত্রসঙ্গীত ও নাটকাভিনয়। অনুষ্ঠানসূচী ব্যয়বহুল। সে ভাবনা দ্বিজেন অথবা উমার নয়। তারা ভয়ানক উল্লসিত হয়ে উঠল।

উমা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল—ইউনিক।

দ্বিজেন বললেন—অপূর্ব।

গদ গদ কণ্ঠে নরেশ বললেন—তাহ'লে আসুন, আমরা কাজ ভাগাভাগি করে নিই। দ্বিজেনবাবু, আপনি প্রথমদিনের অনুষ্ঠানের

ভার নিন। দ্বিতীয় দিনের নাটকের ভার আমার। যন্ত্রসঙ্গীতের ভার থাক উমার ওপর। কি বল উমা? ব'লে কপিশরঙের চক্ষু তারকাদুটির দৃষ্টি নরেশ তুলে ধরলেন উমার মুখের পানে।

উমা খুশীতে উপচে পড়ছিল। কথার সঙ্গে সঙ্গে বলল—আমি রাজী।

দিনক্ষণ স্থির হ'লো। নরেশের ইচ্ছে, কোন একজন মন্ত্রী এসে স্কুলের উদ্বোধন করেন। বিষয়টীর গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়ছে দেখে উমা বিস্মিতা হচ্ছিল। মন্ত্রীর কথা শুনে বেশ খানিকটা হক চকিয়ে গেল। একটু সামলে নিয়ে বললে—মন্ত্রী এ ব্যাপারে আসতে রাজী হবেন কী?

নরেশ গলায় জোর দিয়ে বললেন—হবেন না মানে? সে ভার আমার। তোমাদের সে জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না।

মৃদুহাস্যে উমা বলল—তাহ'লে তো কথাই নেই।

দু মাস ধরে রিহার্শ্যাল চললো পুরোদমে। পান, বিড়ি, সিগারেট, আর্টিষ্টদের জলযোগ আর গাড়ীভাড়ায় জলের মত টাকা খরচ করতে লাগলেন নরেশ। জাঁকজমকের সঙ্গে উৎসব শেষ হলো একদিন। সুদর্শন, তরুণ এক মন্ত্রী এসে স্কুলের উদ্বোধন করলেন। অনুষ্ঠানের সাফল্যে দর্শকরা খুশী হলেন। গ্রামে একটা আলোড়ন এনে দিলেন নরেশ।

সুধীরের দল এই হৈ চৈ সু-নজরে দেখেনি। নরেশের এই শিল্পানুরাগের অর্থ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়লো ওদের কাছে। ইলেক্‌-সানের আগে নরেশের এটা একটা ষ্টাণ্ট, এই হ'লো ওদের মত। অবশ্য অরুণাই এই মতের উদ্ভাবিকা। সুধীর আর তার দলবল মেনে নিয়েছে একথা। ওরা ঠিক করলো, পাল্‌টা একটা ষ্টাণ্ট তারাও দেবে।

সপ্তাহে দু'দিন ক্লাস বসে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অনেক-গুলি ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হ'ল। নিয়মিত চলতে লাগল স্কুলের কাজ।

একদিন ক্লাসশেষে উমা বাড়ী যাব-যাব করছে। এমন সময় নরেশ এসে হাজির হলেন সেখানে। দ্বিজেন এবং আর একজন শিক্ষক আগেই চলে গেছেন। দু'চার জন ছাত্র ছাত্রী তখনো ছিল। উমা একটা গানের স্বরলিপির সঙ্গে মিলিয়ে ঝঙ্কার তুলছিল সেতারে। সুরের মৃদু রেশ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল ঘরময়। নরেশ আসতেই বাজনা থামিয়ে উমা বললো—আসুন। তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললো—আজ এই পর্যন্ত থাক, কেমন ?

ওরা চলে যেতে উমা বললো—বসুন। কিছু বলবেন ?

ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসলেন নরেশ। বললেন—হ্যাঁ, জরুরী একটা কথা বলতেই এলাম।

উমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

নরেশের মুখে একটা মোলায়েম হাসি। চক্ষুতারকায় যেন বিদ্যুতের ঝিলিক। একটু থেমে বললেন তিনি—কাল নমিনেশন পেপার সব সাবমিট হ'য়ে গেছে বুঝেছ ? আমাদের ওয়ার্ডে চারটে সীটে চৌদ্দ জন কনটেষ্ট করবে।

—বেশত! সুলক্ষণ বলতে হবে। গ্রামে কর্মীর অভাব নেই।

—লক্ষণ সু কি কু জানিনে। তবে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে যে আমার চলবে না তা বুঝতে পারছি। যত সব রাস্তার কুকুর গুলো দাঁড়িয়েছে।

শুনে একটু চমকে উঠল উমা। নরেশের সেটা দৃষ্টি এড়াল না। আরও জোরের সঙ্গে বললেন—হ্যাঁ, ওগুলো কুকুর ছাড়া আর কী ?

—কাদের কথা বলছেন ?

—ঐ সুধীর-শশাঙ্কর দলের কথা বলছি।

—তা যে খুশী দাঁড়াক না, ওদের আপনার ভয় কিসের ?

—না, ভয় আমি করি না। তবে ওরা ক্ষতি খানিকটা করতে পারে। আমাকেও তৈরি হতে হবে ভেতরে ভেতরে। তোমাকে যা বলেছিলাম, মনে আছে ?

—আছে। আমি তো আস্তে আস্তে কাজ সুরু ক'রে দিয়েছি।

—কি মনে হ'চ্ছে বলত ?

—শশাঙ্কদার ফেয়ার চান্স। তবে আপনিও সিলেক্‌সান থেকে বাদ পড়েননি। অনেকেই বলছেন, নরেশ বাঁড়ুয্যে ব'লে ভোট দোব না, দোব রামেশ্বর বাঁড়ুয্যের ছেলে বলে।

হঠাৎ নরেশ উমার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন—না উমা, এটা আমার সান্ত্বনার কথা নয়। আমি একা জিতলে কিছুমাত্র খুশী হবো না।

—তবে ?

—আমি যখন দেখব, ঐ কুকুরগুলো ভূত-হারান হেরেছে, তখনই খুশী হবো।

—তা কি সম্ভব ? শাশঙ্কদা কতখানি জনপ্রিয়, তাকি আপনি জানেন না ? ওঁর মতো মানুষকে কুকুর বলা আপনার মুখে শোভা পায় না।

শুনে নরেশ আঘাত পেলেন। উমার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—মানুষকে কুকুর বানানো যায় উমা। কেমন করে জানো ? টাকা দিয়ে। যত লাগে আমি টাকা ঢালবো। ওদের সব কটাকে হারাতেই হবে। সে যেমন ক'রেই হ'ক। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে না উমা ?

—নিশ্চয়ই করব।

আনন্দে জ্বল জ্বল ক'রে উঠল নরেশের কপিশরঙের চক্ষুতরকা-দুটি। উমার মুখের পানে স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন—যেদিন দেখব আমার ইচ্ছে ষোল আনা পূর্ণ হ'য়েছে সেদিন তোমাকে কিছুই আমার অদেয় থাকবে না উমা, এ তুমি দেখে নিও।

বলতে বলতে উমার বাঁ হাতখানা আবার তুলে নিয়ে কাছে আকর্ষণ করতে চাইলেন নরেশ। উমা বুঝতে পেরে খুব আস্তে বলল—এ কিন্তু অন্যায়।

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সহাস্যে নরেশ বললেন—ওহো, তোমাকে একটা সুখবর দিতে ভুলে গেছি। তোমাদের বাড়ীর

ওয়াটার কানেকসান্ স্যাংসন হ'য়ে গেছে। দিন কয়েকের মধ্যে তোমাদের জলকষ্ট দূর হ'বে।

উমার মুখে যে তিক্ততা ফুটে উঠেছিল, এই সংবাদে তা দূর হ'য়ে গেল। কৃতজ্ঞতার সুরে বলল—আপনি মস্ত উপকার করলেন আমাদের। কী ব'লে যে আপনাকে—

বাধা দিয়ে নরেশ বললেন—থাক, থাক, ধন্যবাদ দিয়ে ব'সো না। তোমার কাছে ওই জিনিসটা অন্ততঃ আমি চাইনা।

—তবে ?

—আজ থাক। সেকথা পরে হবে।

স্কুল থেকে কেমন একটা বিস্বাদ অনুভূতি নিয়ে ফিরল উমা। বাড়ীতে শীগ্গীর জলের কষ্ট দূর হবে, এই আনন্দের খবর শুনেও সেই ভাবটা দূর হ'ল না। একটা কথাই কেবল মনের ভেতর ঘোরাফেরা করছিল। নরেশের ভেতর কী দেখল সে ? প্রচণ্ড ক্ষমতালিপ্সা, মানুষকে মানুষ ব'লে মনে না করা আর [illegible] লালসা। এই তো মানুষেব চেহারা। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একটা সং মানুষকে বিত্তবানরা কুকুর বলে প্রতিপন্ন করে। জনসমাজে তাঁকে ধিক্কৃত হ'তে বাধ্য করে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছাকে অবদমিত ক'রে শুধুমাত্র অর্থ এবং প্রতিপত্তির জোরে আপন দুরভিসন্ধিকেই জয়যুক্ত করতে এরা সিদ্ধহস্ত। মানুষের বিবেককে এরা অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভোঁতা ক'রে দেয়।

নরেশ আজ তার নিজের বিবেকটাকেও ভোঁতা ক'রে দিলেন। ওঁর ইচ্ছে পূর্ণ করতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে। নরেশ বলেছেন, সেদিন কিছুই তাকে অদেয় থাকবে না। আশ্চর্য, এই মন্ত্রের কী অসাধারণ গুণ। শক্তিমানের কাছ থেকে পুরস্কার লাভের এই বাসনা মানুষকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠল উমা। সেও নেমে যাবে পুরস্কারের লোভে ? এই কি তার বিধিলিপি ?

এই বোধ হয় তার বিধিলিপি। এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

শুধু উমা নয়, তার মত হাজার হাজার মেয়ে জীবনের মসৃণ পথ হারিয়ে ফেলেছে। জীবিকার প্রয়োজনে পথে পা দিয়েছে তারা। পথ, বিপথ, অলি, গলি চারিদিকে। প্রয়োজনের তারতম্য অনুসারে নানান দিকে তাদের পদচারণা। পথের মিছিলেও যেমন, বিপথেও তেমনি তারা সংখ্যাতীত।

স্বাধীন ভারতে নারীপুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত। যোগ্যতা থাকলে পুরুষের মতই যে কোন উচ্চপদে নারী বসতে পারে। তার সঙ্গে সুযোগও থাকা চাই! উমার যোগ্যতা সামান্য। সেতারের শিক্ষাটুকুই তার সম্বল। এই মূলধন নিয়ে সে বেরিয়েছে জীবিকা অন্বেষণে। বাঁচবে বলেই সে বেরিয়েছে বাড়ীর বাইরে। দিদিদের মতো পড়ে থাকেনি ঘরের কোণ আঁকড়ে।

উমাদের সংসারটি নেহাৎ ছোটখাটো নয়। সাত বোন আর একটি মাত্র ভাই। ভাইটী স্কুলে পড়ে। বাবা সরকারী চাকুরে। সীমিত আয়ে বিরাট পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলে অতি কষ্টে। উমা এই সেদিন পঁচিশ পেরিয়েছে। তার ওপরে তুটি বোন আছে। তাদের বয়স এমন অঙ্কে গিয়ে ঠেকেছে যে বিয়ের কথা ভাবাই যায় না।

জীবন সম্বন্ধে উমার ধারণা বেশ স্পষ্ট হ'য়েছে এতদিনে। বাড়ীর আবহাওয়া ভাল করেই বুঝেছে সে। সেখানে তার জন্যে তু'বেলা তু'থালা মোটা ভাত তরকারী জুটবে মাত্র। আর সামান্যতম পরিধেয়। আর কোন সাধ আহ্লাদ মেটানোর কোন সুযোগই নেই তাদের বাড়ীতে। উমা দেখেছে, দিদিরা নিজেদের বেশ মানিয়ে নিয়েছে অবস্থার সঙ্গে। মনের মধ্যে কোন ক্ষোভ নেই তাদের। মোটা ভাতে, মোটা কাপড়ে তারা কেমন নির্বিকার। যেদিন ভাত থাকেনা, সেদিন কেমন ওরা দোকান থেকে মুড়ি আনিয়ে চিবোয়। উমা পারেনা তেমন। তার চেয়ে উপোস দিয়ে সে আরাম পেয়েছে। মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, নিজের পায়ে সে দাঁড়াবে। কত জনে রোজগার করছে। খেয়ে পরে বাঁচছে, সে কেন পারবে না তাই'লে?

কিন্তু তার তো কোন যোগ্যতা নেই। আঠারো বছর তার কেটেছে মনের ভেতর অসন্তোষ পুষে। স্কুলেও যায়নি, বাড়ীতেও শেখেনি বিশেষ কিছু। তাহ'লে কি রোজগার হবে তার দ্বারা?

উমা দেখেছে, বাবা সকালে হুটি ভাত নাড়াচাড়া ক'রে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ট্রেন ধরেন। কলকাতায় অফিস। ফেরেন অনেক রাত্রে। পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাঁর। বাজার হাট কোনদিনই যেতে সময় পান না। তারাই বাজার, হাট করছে। বড়দির বয়স হ'লে মেজদি। মেজদির পর তার পালা সাঙ্গ হ'য়ে গেছে অনেক কাল। তার পরের হু'বোনের পালাও শেষ হ'য়েছে। এখন ভায়ের পরে সবচেয়ে ছোট বোনটিই বাজার, হাট করে।

উমার বয়স হ'লেও দিদিদের মত ঘরের কোণ আঁকড়ে পড়ে থাকেনি সে। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেছে। বাবা সংসারের সকল ব্যাপারেই উদাসীন। মার শাসন বাবার শৈথিল্যটুকু পুষিয়ে নিয়েও অতিরিক্ত। তবু সে গ্রাহ্য করেনি। বাইরে ছুটে বেরিয়েছে নিজের পথ নিজেই ক'রে নেবে ব'লে।

সে সুযোগ হঠাৎই এসে গেল উমার জীবনে। একটি বাদ্যযন্ত্র আর তার বিখ্যাত বাদক এনে দিল সে সুযোগ। সেতার আর সেতারী। অন্তরের গভীর প্রেরণায় সে সাধনা ক'রে চলল। দীর্ঘদিন ধ'রে, সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে। প্রয়াগ সঙ্গীত সম্মেলন থেকে সে সেতারে ডিগ্রী অর্জন করেছে। স্নাতক। সেই যোগ্যতাতেই আজ সে টিউশিনী ক'রে হু'পয়সা রোজগার করছে।

উমা জানে তার রূপে এমন জৌলুষ নেই যা দেখে পুরুষের মন টলতে পারে। সে চেষ্টাও করেনি কোনদিন। নিঃসঙ্কোচে সে মিশেছে বহু পুরুষের সঙ্গে। তার ফলে একটা পুরুষালী মন তৈরি হ'য়েছে তার মধ্যে ধীরে ধীরে। তার নিঃসঙ্কোচ আলাপে, পুরুষ

বুঝি তার নারীত্বের কথা ভুলে যায়। নারীর প্রতি তাদের সহজাত আকর্ষণ শক্তি যেন স্তিমিত হ'য়ে পড়ে উমার সান্নিধ্যে এসে।

তাহ'লে এখন এমন কেন হ'তে চলেছে? নরেশের আচরণে, কথাবার্তায়, কপিশরঙের চোখের তারায় সে যা দেখেছে, সে সব দেখতে তো সে অভ্যস্ত নয়।

নরেশের আচরণের অর্থ তার কাছে সুস্পষ্ট। কিন্তু কেন? তাঁর তো কিছুরই অভাব নেই। সাজানো সংসার। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পরিজন। ভোগবাসনা কি নিবৃত্ত হয়নি তার মধ্যে? সংসারের সাজানো বাগানের সৌন্দর্য কি নরেশের চোখে আজ বৈচিত্র্য হারিয়েছে?

কিম্বা এ বুঝি ধনীর খামখেয়ালীপনা। জীবনকে নিত্য নূতন বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা। রূপহীনা হলেও কঠিন সংযমে ধ'রে রাখা তার অটুট যৌবন। তার দিকে দৃষ্টি পড়েছে নরেশের। উমা দেখেছে, সে দৃষ্টিতে সুতীব্র ভোগলালসা। তার দেহের মধ্যে সেই লালসা যেন তৃপ্তির উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এ স্বাদ, এ রোমাঞ্চ তার জীবনে নতুন। প্রবীন বয়সী নরেশের প্রথম দিনের সান্নিধ্যে গাটা সামান্য ঘিন ঘিন করে উঠেছিল। যেদিন প্রথম মোটরে গেছে নরেশের সঙ্গে। ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসেছেন তিনি। আস্তে আস্তে তার অস্বস্তি ভাবটা কেটে গেছে। এখন নরেশ তার হাত ধরলে শরীর হিম হয়ে আসে না। গা ঘিন ঘিন করে না প্রথম দিনের মত।

ভারতচন্দ্র পথ ফুরিয়ে গেছে কখন। কখন ব্যানার্জীপাড়া রোডে পৌঁছেচে আর কখনই বা দুটো বাঁক ঘুরে বাড়ীতে এসে পৌঁছে গেছে, খেয়াল ছিল না উমার। কি একটা নেশার ঘোরে যেন সে ছিল এতক্ষণ। আনমনে কী সব চিন্তা করতে করতে এতখানি রাস্তা সে হেঁটে এসেছে, ভেবে মনে মনে লজ্জা পেল। কত রকমারী ভাব খেলে গেছে এই সময়টুকুর মধ্যে। বাড়ীর

সদর দরজার ভেতর পা দিয়ে বুঝতে পারল, নরেশের ছেলেকের কথাবার্তা আর আচরণে তার মনের ভেতর যে তিক্ততা জমে উঠেছিল, তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে একফালি উঠোন পেরিয়ে বৈঠকখানাঘর। চার পাঁচটা সিঁড়ি ভেঙ্গে লম্বা রোয়াক। বাঁদিকে উঁচু পাঁচিলের কোণ ঘেঁসে একটা পঞ্চমুখী জবার বড় গাছ। পাঁচিলের মধ্যিখান বরাবর একটা দরজা। সেটা পেরিয়ে অন্দরের উঠোন।

বাড়ীর ভেতর ঢোকবার সময় উমা বৈঠকখানায় একটা চেনা গলার আওয়াজ শুনতে পেল। অমনি থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। মার সঙ্গে কথা কইছে সুধীর। পায়ে পায়ে জবা গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল উমা।

মা বলছেন—তোমরা এই সব কাজে এগিয়ে আসছ, এ তো সুখের কথা বাবা। তোমাদেরই ত উচিত এই সব ভালো কাজে নামা। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো আমরা তোমাদিকেই ভোট দোব।

সুধীর বলছে—আশীর্বাদ করুন জ্যাঠাইমা, যেন আজীবন মানুষের সেবা করতে পারি। আমি নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য চাই না। কোনদিন চাইব না। আমি চাই গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দিতে। আপনাদের আশীর্বাদের জোর থাকলে জয়ী আমরা হবোই।

মা বললেন—তোমরা ভালো কাজ করছ, ভালো কাজ করবে, লোকে একথা বুঝলে নিশ্চয় তোমাদের ভোট দেবে।

সুধীর বললো—আপনি ঠিক বলেছেন জ্যাঠাইমা। আমাদের বরাবর তাই লক্ষ্য। কাজ করা। জনসাধারণের আস্থাভাজন হবার এই একমাত্র পথ।

সুধীর ইতিমধ্যেই ভোটের ক্যানভাসে বেরিয়েছে। মনের মত করে কথা বলতে পারে বটে। মাকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে এরি মধ্যে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে। আরও কতকগুলো টুকরো কথাবার্তা কানে

গেল উমার। রাগ হচ্ছিল খুব। মনে হচ্ছে এক্ষুনি গিয়ে মুখের ওপর দশটা কথা শুনিয়ে দেয়। না গিয়েও পারল না শেষ পর্যন্ত।

সুধীর যখন বললো—দেখবেন জ্যাঠাইমা, চারটি ভোটই যেন আমাদের প্রার্থীরা পায়। যাকে তাকে দিয়ে ভোটগুলো নষ্ট করবেন না।

আর মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—না বাবা, তোমাদিকেই দোব, তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো।

তখন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে পড়ল উমা। কোমরে ছুটো হাত দিয়ে, গ্রীবা বেঁকিয়ে, কটমট ক'রে সুধীরের পানে তাকিয়ে সে প্রায় চীৎকার ক'রে বলল—একটি ভোটও তোমরা পাবে না যাও। এ বাড়ীর ভোট অন্য প্রার্থীদের জন্যে। ইউ. পি. বির জন্যে নয়।

উমার মা বললেন—কি বলছিস উমা, তুই থাম বাপু। আমাদের কথার ভেতর তোকে কে কথা বলতে ডেকেছে? চুপ কর।

—না, কেন চুপ করবো? স্পষ্টই বলছি, ইউ. পি. বি. মানেই কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিষ্ট মানেই বিদেশীর দালাল, দেশের পয়লা নম্বরের শত্রু। ওদের একটা ভোটও কেউ না দেয়, সেই চেষ্টাই করবো আমরা।

সুধীর ম্লান হেসে বললে—উমাদি, আমাদের সম্বন্ধে যে কথাগুলো এই মাত্র বললে, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, এ তোমার নিজের অন্তরের কথা নয়। অপরের শেখানো কথা। তোমার কথার আমি তাই প্রতিবাদ করবো না এখন। পরে একদিন সময়মত এসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তোমার ভুলটা শোধরাতে চেষ্টা করবো। এখন আসি উমাদি, কেমন?

—তার দরকার নেই। আমি নরেশ ব্যানার্জীর দলে।

—তা জানি।

—আমি তাঁর দলের হয়ে ক্যানভাস করে বেড়াব বাড়ী বাড়ী। তোমাদের পাত্তা পেতে দোব না, এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

—বেশত, তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দেবার কে ? তাই করো। মানুষ যদি জেগে থাকে তো তোমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হবে। আর তাদের জাগা যদি মিথ্যে হয়, তোমার প্রতিজ্ঞা তাহলে নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। আসি জ্যাঠাইমা। ব'লে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হল সুধীর। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল উমা।

মার ডাকে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে উমা। নিজেকে আর সে সংযত রাখতে পারলো না। চীৎকার করে বলে উঠল—ওই কম্যুনিষ্টগুলোকে বাড়ীতে খবরদার ঢুকতে দিও না তুমি। এলে ওদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে।

উমার মা রাগত কণ্ঠে বললেন—আচ্ছা, তাই হবে। এখন চল দেখি।

॥ পাঁচ ॥

এ এক নতুন অভিজ্ঞতা শশাঙ্কশেখরের।

পাড়ায় পাড়ায় ভোট ভিক্ষে করে বেড়ানো। ভোটের ধনে দীন দরিদ্র সকলেই ধনী। যারা ভোট চাইতে যায়, তারা ভিক্ষুকের সামিল।

রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত প্রত্যহ ঘুরতে হয় দলবল নিয়ে। প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে তোতাপাখীর মতো একই বুলি আওড়াতে হয়। আমরা এই করবো আমরা তা করবো।

এই সব কলোনীগুলোর চেহারা এমন করে হয়ত দেখাই হত না শশাঙ্কশেখরের। বর্ষায় জলে জলময় হয়ে যায়। গ্রীষ্মে তীব্র জলকষ্ট এখানে। ঘর অনেকেরই বাঁশের ফ্রেমে আচ্ছাদন দেওয়া। তাও যাদের পুনর্বসতি সরকারী সাহায্য পাবার সৌভাগ্য হয়েছে। অনেকে তাও করে উঠতে পারেননি। ত্রিপলের তাঁবু খাটিয়ে বাস করছেন।

এই সব কলোনীর ভোটার সংখ্যা বিস্তর। এই সব জায়গায় প্রতিপত্তি আছে, এমন লোককে নিয়ে বেরুতে হয়। প্রত্যেক অঞ্চলেই ইউ. পি. বির সমর্থক একজন না একজন প্রতিপত্তিশালী লোক আছেনই।

একদিন রবীন্দ্রপল্লীতে ভোট ভিক্ষে করতে গিয়ে খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন শাশঙ্কশেখর। স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ অভিজিৎ দাসগুপ্ত তাঁদের বাড়ী বাড়ী নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বেলা সামান্য বাকী। একটা টিউবওয়েলের কাছে অসংখ্য মেয়েদের ভীড়। প্রত্যেকের হাতেই বালতী অথবা কলসী। আগে জল নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

তাঁরা কয়েকজন যাচ্ছিলেন সেইখান দিয়ে। আগে ডাঃ দাসগুপ্ত। ভোট-ভিক্ষুকের দলকে পাড়ায় ডেকে আনার অপরাধে কয়েকজন মহিলা জল নেওয়ার কথা ভুলে তাঁকে ঘিরে ধরল। একসঙ্গে নিজেদের সমস্ত অভিযোগ তারা শোনাতে চেষ্টা করল সঙ্গে সঙ্গে।

ডাঃ দাসগুপ্ত অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁদের নিরস্ত হতে বলেন। কে কার কথা শোনে। শেষে চীৎকার করে ডাঃ বললেন আপনাদের ভেতর একজন কেউ কথা বলুন, আমরা শুনছি। নইলে আমরা আপনাদের ঠেলে ঠুলে চলে যাব বলে দিচ্ছি। বলে সত্যিই তিনি হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন। ওষুধে কাজ হয়েছে দেখা গেল। নিজেরা পরামর্শ করে একজনকে কথা বলার জন্যে ঠিক করল।

মহিলাটী কণ্ঠে বেশ ঝাঁঝ মিশিয়ে বললেন—আপনেরা মান্যি লোক, ভোট চাইতে আইছেন, ভাল কথা। অখন কথা হইল কি, ভোট আপনেগো দিমু ক্যান? আমাগো কি মানুষ ভাবছেন আপনেরা?

ডাঃ দাশগুপ্ত বললেন—আহা, এ কী বলছেন আপনি? আপনাদের মানে আমাদের অভিযোগ অনেক আছে। কিন্তু তার জন্যে দায়ী তো এঁরা কেউ নন। এদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেখুন, আপনাদের অবস্থার প্রতিকার হয় কিনা?

—হ, পিতিকার যা হইব, সে বোঝা গেছে। কয় না, যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ। অখন নিত্য এই পথ মাড়াইতেছেন কাজ গুছান হইলে টিকি পাওয়া যাইব না।

সমবেত মহিলারা তাঁর কথায় সায় দিলেন।

ডাঃ দাশগুপ্ত মনে মনে রুষ্ট হলেন। প্রার্থীদের ভেতর উপস্থিত ছিলেন শুধু শশাঙ্কশেখর। অন্য তিন জন দলবলসহ অন্যান্য এলাকা ঘুরছেন। শশাঙ্কশেখরকে দেখিয়ে ডাঃ স্বর চড়িয়ে বললেন—এই যে ভদ্রলোককে দেখছেন, ভদ্রলোক একজন

প্রফেসার, শশাঙ্কশেখর মৈত্র, নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, এই সব শিক্ষিত লোক কি মনে করেন, আপনাদের ভাঁওতা দেবার জন্যে কমিশনার দাঁড়াচ্ছেন? এঁরা এসেছেন, আপনাদের কাছে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই সব অনুন্নত এলাকাগুলোর জন্যে কাজ করবার মিশন নিয়ে। এখানের রাস্তাঘাট, জলনিকাশের ব্যবস্থা, পানীয় জল—

—হ, আর কিছু না হউক, এডা আগে করেন, তবে না বুঝুম আপনেরা একটা কামের মত কাম করলেন। কে পোফেছার কে নচ্ছার আমাগো জাইন্যা লাভ কী! বলতে বলতে নারিবাহিনী ব্যূহ ভেঙ্গে বিদায় নিল।

এই রকম কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই না হ'ল শশাঙ্কশেখরের। ভেবে দুঃখ পান, মানুষ তাঁকে দিনদিন যেন একটি গোষ্ঠীর ভেতর ঠেলে দিয়ে পর ভাবছে। গ্রামের সমস্ত মানুষের কাছ থেকে সেই আগের মত আর স্নেহ, ভালবাসা যেন পাচ্ছেন না। রাজনীতির তুলাদণ্ডে তাঁকে বিচার করতে সুরু করেছে সবাই। পরিচিত বন্ধুবান্ধবও কেমন আশ্চর্যভাবে পর হ'য়ে যাচ্ছে। কেন তবে এই মোহ পেয়ে বসল তাঁকে? রাজনীতির মঞ্চে তিনি উঠে দাঁড়াতে চাইলেন কিসের আকর্ষণে?

নলিনী এর উত্তর দিয়েছে। তাঁর স্ত্রী। নলিনী বলেছে— নাম কেনবার সখ! নামের কাঙাল। শশাঙ্কশেখর শুনে মনে মনে হাসেন। কথাটা মিথ্যে বলেনি নলিনী।

সেদিন চারজন প্রার্থীরই রাত্রি দশটায় বড়বাড়ীর সামনে মিলিত হবার কথা ছিল। বারোয়ারী তলায় যে মিটিং হবে, তারই আলোচনার জন্য। শশাঙ্কশেখর এবং তাঁর দলের জনা পাঁচেক ন'টার মধ্যেই নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হলেন। একজন বলল— চলুন শশাঙ্কদা, এখনো এক ঘণ্টা দেরী, ক্ষেতুদার বাড়ী থেকে ঘুরে আসা যাক।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শশাঙ্কশেখর বললেন—চল।

ক্ষেত্রনাথের বাড়ীখানা যেন বৃন্দাবন। গোপ-গোপীনির মেলা। ক্ষেত্রনাথ বাংলা-সাহিত্যে, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রসাহিত্যে সুপণ্ডিত। সেই কারণে বহু ছাত্র-ছাত্রী আসে তাঁর কাছে। ক্ষেত্রনাথের বাড়ীর পরিবেশ তরুণ-তরুণীদের মনের মত। একেবারে বাধা-বন্ধ-হীন। তাদের পথ দেখিয়ে দেন ক্ষেত্রনাথ নিজেই নিজের হয়ত অগোচরেই। প্রৌঢ় ক্ষেত্রনাথ নিজে দেখতে মোটেই সুপুরুষ নন। অনেকগুলি পুত্র কন্যার জনক। মেয়েরাও বড় হয়েছে। একঘর তরুণ-তরুণীর সামনেই তিনি হয়তো সুন্দরী একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—আয় মাধব, তোকে একটা চুমু খাই। কিম্বা হয়তো দুজনকে দুধারে কাছে টেনে বললেন—ওরে ললিতে, বিশাখে, কাছে আয়।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে যে নারীভাবের কথা বলা আছে, ক্ষেত্রনাথের হয়ত সেই ভাব। নারীভাবে নারীকে স্বগোত্র ব'লে আলিঙ্গন, চুম্বন করেন।

কিন্তু তাও তো নয়। একবার তাঁর জন্মদিনে উপস্থিত ছিলেন শশাঙ্কশেখর। ভক্ত তরুণ-তরুণীরা তাঁকে উপহার দিল, মনের মত ক'রে সাজাল। কথায়, গানে গাইল তাঁর প্রশস্তি-গীত। সেই অনুষ্ঠানে মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা এলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করতেই ক্ষেত্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আরক্তিম মুখে মহিলা বলে উঠলেন—ছাড়ো ঠাকুরপো, তোমার দাদা আসছেন পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রনাথ ছেড়ে দিলেন মহিলাকে। তবে কি এর ভেতর পাপ বোধ রয়েছে। মনে মনে বিচার করেও ঠিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি শশাঙ্কশেখর।

সে যাক্। ক্ষেত্রনাথ হয়ত এ সব সরল মনেই করেন। কিন্তু এ সব যারা দেখে, তাদের মনে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বৈষ্ণব পদাবলী খুবই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। কিন্তু তার পরকীয়া প্রেমের কীর্তনে দেশের অনিষ্ট হবে, এই আশঙ্কায় স্বামীজি কীর্তন পছন্দ করতেন না। ক্ষেত্রনাথ তরুণ-তরুণীদের সুন্দরের

আরাধনা করবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে *গিয়ে* অসুন্দরের পথ সৃষ্টি ক'রে দিলেন তাদের সামনে। তারা মহোল্লাসে সেই পথে যথেচ্ছ বিচরণ করতে লাগল। ক্ষেত্রনাথের বাড়ী হ'য়ে উঠল যেন বৃন্দাবন। একদিন ক্ষেত্রনাথকে এর ফল হাতে হাতে পেতে হ'ল। সে অনেক কথা।

এ সব কথা হঠাৎ ভেসে উঠল শশাঙ্কশেখরের মনে। ক্ষেত্রনাথের বাড়ীর কাছে এসে চমক ভাঙ্গল তাঁর। গানের সুর ভেসে আসছে তাঁর বাড়ী থেকে। কে একজন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে। ভারী মিষ্টি লাগছিল গলাটি। শশাঙ্কশেখর ও তাঁর অনুচররা গিয়ে বসলেন ঘরে। চোখ বুজে গান শুনছেন ক্ষেত্রনাথ। ছেলে মেয়ের সংখ্যা খুব কম। ভাঙ্গা আসরের মত মনে হচ্ছিল। গান থামলে শশাঙ্কশেখর বললেন—আমরা এসেছি—

ক্ষেত্রনাথ মৃদু হেসে বললেন—বুঝেছি কেন এসেছিস, ভোট চাইতে? আমার ভোটই নেই!

—সে কি?

—হ্যাঁ। ইউ. পি. বির গাধাগুলো জানে তো, আমাকে ভোটার করলে ভোট নিজেরা পাবেনা, তাই করেনি! এখন তুই এসেছিস ভোট চাইতে? বেরো হতভাগা! শীগ্গীর বিদেয় হ।

সহাস্যে দলবল নিয়ে বেরিয়ে এলেন শশাঙ্কশেখর। তখন রাত্রি দশটা বাজে। বড়বাড়ীর কাছে পৌঁছে দেখেন, সবাই এসে গেছে। তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য ক'রে করজোড়ে বললেন—আমাকে আর আটকিয়ো না ভাই, রাত হ'য়ে গেছে। কাল মিটিংয়ের কথা আলোচনা করা যাবে।

প্রার্থী সুবিনয় গাঙ্গুলি বললেন—তাহ'লে শশাঙ্ক, তোমার বাড়ীতেই কাল আলোচনা হবে।

মনে মনে প্রমাদ গনলেন শশাঙ্কশেখর। মুখে বললেন শুধু—আচ্ছা, তাই হবে। কাল বিকেলে। আচ্ছা, আমি আসি।

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলেন শশাঙ্কশেখর। নলিনী একা থাকে। দু'দুবার চুরি হ'য়ে গেছে তাঁর বাড়ীতে। এ নিয়ে অশান্তি কম নয় নলিনীর। তাঁর বাইরে বাইরে ঘোরা একেবারেই পছন্দ করে না সে। তাছাড়া আজ ছেলেটার শরীর ভালো নেই। অষুধের কথা বলেছিল নলিনী, ভুলে গেছেন সেকথা।

রাত্রি সাড়ে দশটায় বাড়ী ফিরে উপযুক্ত অভ্যর্থনা পেলেন তিনি। এ তাঁর গা সওয়া হয়ে গেছে। মুখ বুজে খেয়ে নিয়ে শয্যা নিলেন। ঢক্ ঢক্ ক'রে এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ল নলিনী। তাকে খাবার কথা বলতে সাহসই হ'ল না শশাঙ্কশেখরের।

বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে জেগে ভাবতে লাগলেন তিনি, দোষ তাঁরই। সংসার করা উচিত হয়নি তাঁর। যখন নলিনীকে জীবনে বরণ করেছেন, তখন তার কথা না শোনা অন্যায়। পরক্ষণে শিউরে উঠে ভাবেন, ছিঃ ছিঃ, সংসার, স্ত্রী পুত্র নিয়ে তো মত্ত সবাই। মানুষের কাজ যদি না করতে পারলেন তবে মানুষ হ'য়ে জন্মেছিলেন কেন? করুক নলিনী রাগ, এতে কিছু আসে যায় না।

পরদিন নিয়ম মত সব কাজই সেরেছেন শশাঙ্কশেখর। বাজার, টিউশিনি, ছেলের অষুধ, কলেজ। বিকেল চারটে নাগাদ ওঁরা কয়েকজন এসে হাজির। সবে কলেজ থেকে ফিরেছেন তিনি। ডেকে বসালেন সবাইকে। মুখখানা কেমন যেন গম্ভীর। সুবিনয়ের সেটা দৃষ্টি এড়াল না। একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে জিগ্যেস করলেন—এসে কোন অসুবিধে করলাম না তো?

ম্লান হাস্যে শশাঙ্কশেখর জবাব দিলেন—না, না, বসুন। অসুবিধে থাকলে কালই বলতাম।

সুধীর বললো—আসুন, আমরা আলোচনাটা আগে সেরে নিই। সময় নষ্ট করলে চলবে না। আবার বেরুতে হবে আমাদের।

পরাণচন্দ্র বিশ্বাস সুধীরের কথায় সায় দিলেন। ইনিও একজন প্রার্থী। অত্যন্ত কর্মঠ এবং সৎ ব্যক্তি। কথা বলেন খুব কম।

ডাঃ অভিজিৎ দাসগুপ্তও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বল[redacted]—আরম্ভ হওয়ার আগে আমাকে এক গ্লাস জল খেতে হবে।

সুবিনয় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—চারটে বেজে গেছে, এক কাপ ক'রে চা হ'লে মন্দ হ'ত না।

সুধীর বললো—শশাঙ্কদার এতে যদি কোন অসুবিধে না হয় সেই শর্তে আমি চায়ের কথা বলতে রাজী আছি।

পরাণচন্দ্র এ কথায় মৃদু হেসে সায় দিলেন।

লজ্জিতভাবে শশাঙ্কশেখর বললেন—না, না, এতে অসুবিধের কী আছে। আপনারা আলোচনা চালান। আমি চা, জল নিয়ে আসছি।

শশাঙ্কশেখর ভেতরে গেলেন।

নলিনী তখন ছেলের মাথায় জলপটি দিচ্ছিল। জ্বরটা খুব বেড়েছে। মাথায় হাওয়া করছে বসে বসে। এ অবস্থায় কী করেই বা বলা যায়, চা ক'রে দাও।

শশাঙ্কশেখরকে ঘরে ঢুকতে দেখে নলিনী তাকিয়েছিল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। এক গ্লাস জল গড়াতে গড়াতে শশাঙ্কশেখর বললেন —কয়েকজন বন্ধু এসেছেন, চা ক'রে দিতে পারবে?

বারুদের স্তূপে যেন জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি পড়ল। নলিনার ক্রোধাগ্নি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল। রাগে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার ক'রে বলল—একথা তুমি বলছ কোন্ আক্কেলে? ওই সব মুখপোড়াগুলো তোমার মাথাটা একেবারে খেয়ে ফেলেছে দেখছি! ওদের চা ক'রে খাওয়াবে। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করছি, দাঁড়াও—বলে উঠে এল নলিনী।

—আঃ চুপ করো, ওঁরা শুনতে পাবেন যে! পাগল হ'লে নাকি?

—তোমার মত মানুষের হাতে পড়লে পাগল হ'তে বাকী থাকে? জল কী হবে? ওই ঝাঁটাখেকো কম্যুনিষ্টগুলোকে খাওয়াতে হবে? না, এসব চলবে না এখানে। ব'লে এক থাবড়া

মেরে জলের গ্লাসটাকে শশাঙ্কর হাত থেকে ফেলে দিল নলিনী। দেওয়ালে লেগে গ্লাসটা ছিটকে পড়ল একদিকে। গ্লাসের জল ছিটকে পড়ল চারধারে।

শশাঙ্কশেখরের চোয়াল কঠিন হ'য়ে উঠল। একবার ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকালেন নলিনীর দিকে। আক্রোশে ফুলছে সে। এই মুহূর্তে আঁচড়ে, কামড়ে স্বামীকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিতে পারলে তবে যেন শান্তি হয়। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শশাঙ্কশেখর।

বৈঠকখানায় ঢুকতেই সুবিনয় উচ্চহাস্যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। হাসি থামিয়ে বললেন—আরে শশাঙ্ক এসো, এসো। আমরা এ ঘর থেকে সব শুনেছি। এসব আমাদের গা সওয়া। তোমাকে চা-জল নিয়ে আর মন খারাপ করতে হবে না। এসো, আলোচনাটা সেরে নেওয়া যাক।

মনের মধ্যে এক রাশ উদ্বেগ নিয়ে এক পাশে বসে পড়লেন শশাঙ্কশেখর। নিজেকে ভয়ানক অপরাধী মনে হচ্ছিল। আলোচনার একটি কথাও কানে গেল না তাঁর। ঘুরে ফিরে কেবলি মনে হ'তে লাগল, নলিনী এমন হৃদয়হীনা কেন হ'ল? এমন তো সে ছিল না। তার এই পরিবর্তনের জন্যে তবে দায়ী কি তিনিই?

॥ দুই ॥

গোটা নয়নপুর পৌরসভার অধীন এলাকা সরগরম। পোস্টার আর ফেস্টুনে দেওয়াল, রাস্তার মোড় ছেয়ে গেছে। নির্বাচনী ইস্তাহার আর ব্যালট পেপারের প্রতিলিপি ছড়ানো হ'চ্ছে মুড়ি মুড়কীর মত। ভোট ভিক্ষের বাঁধা গৎ শুনতে শুনতে ভোটাররা মরিয়া হ'য়ে উঠেছেন। দলের পর দল এসে চষে ফেলছে গৃহস্থের উঠোনের মাটি। প্রত্যহ সকাল থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত। ভোটপর্ব চুকলে যেন সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

২২শে মার্চ নির্বাচনের তারিখ। সপ্তাহখানেক মাত্র আর বাকী। বিভিন্নপ্রান্তে নির্বাচনী সভা আহূত হ'চ্ছে ঘন ঘন। ইউ.

পি. বির উদ্যোগই এ ব্যাপারে বেশী। তাদের হৈ চৈ দিনের পর দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সে তুলনায় অপর প্রার্থীরা সংযত। কাজ তাঁরাও করে চলেছেন। তবে সেটা মাত্রা ছাড়ায়নি। উভয় পক্ষই রিক্সায় মাইক চাপিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে নিজ নিজ প্রার্থীদের সমর্থনে।

সেদিন বারোয়ারী তলায় ইউ. পি. বির মিটিং। বিখ্যাত এক বামপন্থী নেতা সভাপতিত্ব করছিলেন। সভায় জন সমাবেশ হ'য়েছিল প্রচুর।

প্রার্থী চারজন ভাষণ দিলেন। পরাণচন্দ্র, সুবিনয়, সুধীর, শশাঙ্কশেখর। তাঁদের সমর্থনে খুব জোরালো ভাষায় বক্তৃতা করলো অরুণা। বেশ গুছিয়ে তার বক্তব্য পেশ করল। শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে শুনল তার কথা।

অরুণা বলল—শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত বন্ধুগণ—আগামী ২২শে মার্চ নয়নপুর পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আটটি ওয়ার্ডে ভোটাধিকার প্রাপ্ত জনসাধারণ মোট পঁচিশজন কমিশনার নির্বাচিত করবেন। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সত্ত্বেও নাগরিক জীবনে পৌরসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে নয়নপুর পৌরসভায় প্রগতিশীল শক্তির জয় হবে—না, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জয় হবে তারই সুচিন্তিত রায় ঘোষণা করবেন আপনারা। বন্ধুগণ, তাই এই আসন্ন নির্বাচন আমাদের নাগরিক জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, একথা আমরা যেন ভুলে না যাই। আপনারা জানেন, সংযুক্ত প্রগতিশীল সংস্থা পৌরজীবনের সমস্যাগুলো নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে একটি নতুন শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পৌরজীবনের উন্নতির জন্যে একটি কর্মসূচী পেশ করে। কিন্তু গত নির্বাচনে ইউ. পি. বি, র মাত্র বারজন প্রার্থী নির্বাচিত হন। এর ফলে ইউ. পি. বি. দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না। তা সত্ত্বেও আমাদের নির্বাচিত কমিশনাররা সমস্ত দুর্নীতি ও ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে নিঃস্বার্থ

নিরবচ্ছিন্নভাবে পৌরজীবনের মান উন্নয়নের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। কখনো বিরোধীদলরূপে কখনো একটি নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে অন্যান্য কমিশনারদের সাথে কোয়ালিশন বোর্ড গঠন ক'রে ইউ পি. বির কর্মসূচী অন্ততঃ পক্ষে কতকগুলো বাস্তবে রূপায়িত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান।

আসন্ন নির্বাচনে ইউ. পি. বির পঁচিশ জন প্রার্থী একটি কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গত কয়েক বছরে আমাদের দলীয় কমিশনারদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, বাংলাদেশের পৌরসভা আন্দোলনের যে শিক্ষা, তারই ভিত্তিতে আমরা আপনাদের সামনে আগামী দিনের জন্যে এমনি একটি কর্মসূচী পেশ করেছি। বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয়ই আমাব সঙ্গে একমত হবেন যে, নাগরিক জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে এটা অবশ্য করণীয়। এই কর্মসূচী কার্যকরী করার জন্যে প্রয়োজন পর্যাপ্ত সরকারী সাহায্য, কর্মীদের অনলস প্রচেষ্টা আর জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

বহুক্ষণ বক্তৃতা দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এল অরুণা। সমবেত শ্রোতার করতালি শব্দে তখন সভাপ্রাঙ্গন মুখরিত। সভাপতির ভাষণের পর একটি পোস্টার নাটিকাও অভিনীত হয়েছিল।

দিন দুয়েক বাদে। বিকেলের দিকে অরুণা বেরিয়েছিল ইলেকসান ক্যাম্পেনে। সঙ্গে ছিল দীপা। দীপারাও এ গ্রামের পুরনো বাসিন্দে। পুরনো আমলের মিত্তির বাড়ীর প্রাচীনতার কৌলীন্য বড়বাড়ীর পরেই। মিত্তিরদের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি বড়বাড়ীর বাসিন্দেদের চেয়েও বেশী। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্যে এই বংশের একজন স্বনামে চিত্রিত হ'য়েছেন।

দীপা অরুণার বন্ধু। তাকে দলে ভিড়িয়েছে অরুণা। সে জানত, মুখে সুধীর যতই বলুক, মেয়ে কর্মী সে যোগাড় করতে পারবে না। যদিও মুখে সে বলেছে, এক ডজন জোগাড় ক'রে দেবে, কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে একা সে ছাড়া কেউ নেই। তাই

নিজেই সে যোগাড় ক'রেছে দীপাকে। একা একা কাজ করা যায় না।

দীপার মা-বাবা থাকেন ঘাটশিলায়। ওর দাদা এখানে আছেন। আর বুড়ী পিসীমা। মিত্তিরবাড়ীর অপর ওয়ারিশনরা পৃথক হ'য়ে নিজের নিজের ভাগ আলাদা ক'রে নিয়েছেন।

দীপাকে দলে ভেড়াতে কম বেগ পেতে হয়নি অরুণাকে। দীপার কথা মনে পড়তেই তার মত চাইতে গিয়েছিল সেদিন। নির্বাচনের কাজে তাকে সাহায্য করতে রাজী আছে কিনা। দীপা সোজা তার দাদাকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

—তুই দাদাকে ব'লে দেখ।

—তোর দাদার অমতে আসবি না, এই তো?

—বারে, তাই পারি?

—আমি অমন কারো তোয়াক্কা রাখিনে। বেশ, বলছিস যখন, তোর দাদাকেই বলছি।

বিজিত তখন তার পোষাক বার করছিল আলমারী থেকে। অরুণা ঢুকেছে সে চেয়ে দেখেনি। পায়ের আওয়াজ শুনে আলমারীর ভেতরে চেয়েই সে জিগ্যেস করল—কোন স্যুটটা পরি বলত দীপু।

—যেটা ইচ্ছে।

অবাক হ'য়ে তাকাল বিজিত। চেয়ে দেখল, অরুণা দাঁড়িয়ে। মুখে তার মিষ্টি হাসি।

—কি খবর অরুণা? দীপু তো—

—হ্যাঁ, তার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে। এখন আপনাকেই দরকার। বেরুবেন কোথাও নিশ্চয়ই। আমি বেশী সময় নেব না।

বিজিত কিছু বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করল—কি দরকার বল?

—বলছি। তবে আপনাকে যে কথা বলবো, সেটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার সামিল হবে না তো?

—তার মানে ?

—কথাটা বললাম এইজন্যে, যে কোনও লোকের একটা না একটা পলিটিক্যাল বায়াস্ থাকে। আপনি তার থেকে মুক্ত। আপনার পরিচয় এদিক থেকে জানা থাকলে আমি অনেকটা নির্ভয়ে কথাটা পাড়তে পারতাম।

—ব্যাপার কী বলে ফেল। আমি বেরুব এক্ষুণি।

অরুণার্ কথার মারপ্যাঁচে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল বিজিত। আলমারী থেকে একটা স্যুট টেনে বের করল সে।

অরুণা একটু থতমত খেয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত লাগল নিজেকে সামলাতে। তারপর শান্তস্বরে বলল—দীপা আমার সঙ্গে ইলেক্‌সানের ব্যাপারে ক'টা দিন কাজ করুক, এটা আপনার অনুমতি সাপেক্ষ।

—বেশত, ইচ্ছে হয় করবে। দীপু, ও দীপু—

দীপা এসে দাঁড়াল।

—দীপু্ শুনেছিস, অরুণা কী বলছে ?

—শুনেছি। তোমার মত না হলে—

—থাম, থাম। যাস অরুণার সঙ্গে। যাবার সময় পিসীমাকে বলে যাস। তারপব অরুণার দিকে তাকিয়ে বললো বিজিত—হয়েছে তো ? যাও এ .র, আমি পোষাক বদলাব।

অরুণা আর দীপা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেদিন।

সেই দীপা। তাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পেনে বেরিয়েছিল অরুণা। অনেক জায়গা ঘুরে এসে ঢুকল ঠাকমার বাড়ীতে। রাস্তার ওপরেই উঁচু দেউড়ী। সামনে সদর দরজা। দরজার ওপরে কাঁচের ফ্রেমে গণেশ-মূর্ত্তি।

সদর দরজা পেরিয়ে এক ফালি উঠোন। বাঁদিকে ঠাকমার ফুল বাগান। ওপাশে তাঁর স্বহস্তে তৈরী তুলসীমঞ্চ। কড়ি দিয়ে গাঁথা বিরাট একটা মালা জড়ানো সেখানে। পাশে মহাদেবের ত্রিশূল পোঁতা। উঠোনের পরে লম্বা রোয়াক। তারপর ঘেরা

বারান্দা, দোতলা সারি সারি ঘর। প্রচণ্ড সংস্কার পন্থীর বাড়ী। ঠাকমা, ঠাকুরদা, তাঁদের তিন ছেলে, তিন বউ, অনেকগুলি নাতি, নাতনী নিয়ে বিরাট সংসার। একটি বাড়ীতেই আটজন ভোটার।

ঠাকমার দশাসই চেহারা। গোলগাল, নাদুস নুদুস গড়ন। চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী পরেন। মাথার চুলে পাক ধরেছে। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। মুখে সব সময় আধ্যাত্মিক কথাবার্তা। তাঁর কাছে এলেই ব্রহ্মবিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ শোনা যায়। ঠাকমা যেন এই দুঃখ কষ্টে ভরা পৃথিবীর মানুষ নন। সব সময় বিরাজ করেন অতীন্দ্রিয় এক জগতে। সেখানে আনন্দ ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি নেই।

আর ঠাকুরদা ঠিক তাঁর বিপরীত। রোগা, লম্বা চেহারা। বয়স হওয়ার ফলে সামান্য মেদ দেখা দিয়েছে। চোখেই পড়ে না সেটা। বরং চেহারায় মসৃণ সুন্দর লালিত্য এনে দিয়েছে। বেশ পণ্ডিত লোক। নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত। সঙ্গীত রচনাতেও সমান দক্ষতা তাঁর। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ঠাকুরদার ব্যক্তিত্বকে নীরস ক'রে তোলেনি। ঠাকুরদা অতি মাত্রায় নিরভিমান আর সুরসিক।

অরুণা আর দীপা এই বাড়ীতে এসে ঢুকলো। ঠাকমার অবাস্তব আধ্যাত্মিক কথাবার্তার ভয়ে তাঁর দিকে ঘেঁসল না তারা। ঠাকুরদার দুপাশে দুজনে গিয়ে বসে পড়ল। ঠাকমার কথা শুনতে ভালো লাগে না অরুণার। নীতিকথার বেড়া ডিঙিয়ে জীবন এখন ইচ্ছেমত ছুটে চলে। তাতেই মানুষের আনন্দ। এ যুগে কেই বা শুনবে ঠাকমার নীতি কথা? অরুণা হাঁপিয়ে ওঠে। তার চেয়ে ঠাকুরদার সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখ আছে। তিনি মনোযোগ দিয়ে অপরের কথা শুনে যান। মাঝে মাঝে ফোড়ন দেন একটু ক'রে। আর ঠাকুমা অপরের মুখ বন্ধ ক'রে দেন নিজেই অনর্গল কথা ব'লে। তাঁর কাছে আসল কথা বলি বলি করেও বলা হয় না। সেখানে অপরে শুধুই শ্রোতা।

অরুণা দাদুর কাছে ক্যাম্পেন চালিয়ে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ নীরবে শুনে তিনি জিগ্যেস করলেন এক সময়—নাতনী, তুমি যে

সেদিন বক্তিমে দিলে। বেশ বললে যা হোক, সোনার পাথরবাটির কথা।

দীপা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

অরুণা অবাক হ'য়ে জিগ্যেস করল—কেন দাহু? আমি তো তেমন কিছু বলিনি?

—ঐ যে বললে জলের ট্যাঙ্ক বসাবে। মাতৃমঙ্গল, হাসপাতাল, দাতব্যচিকিচ্ছের ব্যবস্থা করবে। নর্দমা তৈরী করবে। হেন তেন সাত সতের আরো কত কী করবে। আবার নাগরিকদের ওপর অন্যায় ভাবে ট্যাক্স বাড়ার বিরোধিতা করবে। এটা সোনার পাথর বাটি ছাড়া আর কী?

—এটা বুঝলেন না দাহু? মিলগুলোর ওপর ট্যাক্স বাড়িয়ে আয় বাড়ানো হবে।

—বটে? এমনিতেই মিলওয়ালাদের ওপর ট্যাক্স খুব বেশী বেশী নেওয়া হচ্ছে। এর ওপর বাড়ালে তারা ক্ষেপে যাবে না? মিউনিসিপ্যালিটি যা ট্যাক্স নেয় তার বদলে কী ওরা পায়? লবডঙ্কা! ব'লে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়লেন।

দীপা আবার হেসে উঠল। মুখচোখ লাল হ'য়ে উঠল অরুণার। কিছু একটা কৈফিয়ৎ দেবার কথা ভাবছিল মনে মনে। এমন সময় হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। উমা এসে উপস্থিত হ'ল সেখানে। সেও একই উদ্দেশ্যে এসে হাজির হ'য়েছে। অরুণা ঠাকুরদাকে কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। উমাকে দেখে তার মুখের কথা মুখেই আটকে রইল।

অরুণারা যেদিকে বসেছিল, উমা সেদিকে গেল না। লম্বা বারান্দার একেবারে ওপ্রান্তে ঠাকমা পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। হামানদিস্তেতে পান থেঁতো করছিলেন তিনি। উমা একেবারে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে আবদারের সুরে বললো—ভাগ্যি ভালো, ওরা তোমাকে দখল ক'রে বসেনি ঠাকমা! তুমি মানেই তোমার গোটা পরিবার, কি বল?

ঠাকমা উমার হাত দুটো ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন—ছাড় বাপু, দম বন্ধ হ'য়ে আসে। তারপর ছেঁচা পান মুখে পুরে বারকতক মুখটা নাড়লেন ঠাকমা। তারপর চোখ বুজে আধ্যাত্মিক ভাবে বিভোর হ'য়ে বললেন—আমার চোখে সব সমান। তুমিও যেমন, ওরাও তেমন। আমার বড় ছেলেটিও যেমন, ছোট ছেলেটিও তেমন। নরেশও আমার নাতি, সুধীরও তাই।

—এখানে তো চোদ্দজন দাঁড়িয়েছে ঠাকমা। সবাইকে সমান চোখে দেখলে চারটে লোককে বাছবেন কেমন ক'রে?

—দরকার কি। ব্রহ্ম সর্বভূতে বিরাজ করছেন। আমি চোদ্দজনকেই ভোট দোব, কাউকে নিরাশ করবো না।

—সে কি ঠাকমা। তাহ'লে আপনার ভোট তো বাতিল হ'য়ে যাবে।

—যায় যাবে। আইন তা সে আইনই। ঠাকমার জন্যে তো আর আলাদা আইন তৈরী হবে না। সত্য এক। কিন্তু ঠাকমার ওপর কেউ তো রাগ করতে পারবে না। আমি সবাইকে ভোট দিয়ে আসব। কেউ না পেল তো আমি কী করব। আমার কাছে সবাই সমান।

ওধার থেকে ঠাকুরদা ফোড়ন দিলেন—কর্মের ষাঁড় তো দাঁড়াচ্ছে চোদ্দজন। তাদের ভেতর মোটে তিনটের গাই গরু দেখতে পাচ্ছি। বাকী সব কোথা?

অরুণা হাসতে হাসতে জবাব দিল—আমরা দুজন চারজন ইউ. পি. বি প্রার্থীর গাই গরু ঠাকুরদা, বাকী গুলোর খবর রাখিনে।

হঠাৎ উমা গলার স্বর চড়িয়ে ব'লে উঠল—ওই কম্যুনিষ্টদের পাত্তা দেবেন না ঠাকুরদা।

অরুণা ক্রুদ্ধস্বরে বললো—কাদের পাত্তা দিতে হবে, ঠাকুরদা তা ভালই জানেন।

শুনে ভয়ানক রেগে গেল উমা। ঠাকমার পানে চেয়ে বলল—শুনছেন ঠাকমা?

নিমীলিত চোখে মুখ নাড়তে নাড়তে ঠাকমা বললেন—হ্যাঁ শুনছি। চোখ বুজেই দেখছি সব। বিশ্বজুড়ে যে খেলা চলছে, তোমরাও সেই খেলা দেখাচ্ছ। তুমি ভাবছ, তোমার মতটাই ভালো। তোমার পথটাই ভালো। জগতের লোক সেই মতটা মেনে নিক। সেই পথে লোকে চোখ বুজে চলুক। ওরাও ভাবছে সেই কথা। শুধু বিবাদের গোড়া হ'ল মত আর পথ নিয়ে। থাক্ না বাপু নিজের মত আর পথ নিয়ে। অন্যের পথে দাঁড়িয়ে বাগড়া দিস কেন? ভগবানের সাম্যনীতি ভুলে যাস কেন?

উমা গলার স্বর চড়িয়ে বললো—ঐ দেখুন ঠাকমা, ওরা হাসছে আপনার কথা শুনে। দেখলে গায়ে জ্বালা ধরে। ঠাকমা, ওদের এক্ষুনি দূর করে দিন বাড়ী থেকে। নরেশদা ঠিকই বলেন। রাস্তার যত সব কুকুরগুলোর কমিশনার দাঁড়াবার শখ হ'য়েছে। এবার উনি এদের উচিত শিক্ষা দেবেন।

ঠাকমা আর চোখ বুজে বসে থাকতে পারলেন না। চোখ মেললেন। অতীন্দ্রিয় ভাব জগতে যাঁর বাস, তিনি মুহূর্তে বাস্তব জগতে ফিরে এলেন। ক্রোধে নাসারন্ধ্র স্ফীত হ'য়ে উঠল তাঁর। বড় বড় চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বার হ'তে লাগল। ঠোঁট দুটো কাঁপছিল থর থর ক'রে। চীৎকার ক'রে তিনি বলে উঠলেন—ওদের বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিতে বলছ? এত বড় আস্পর্দা? আমার বাড়ীতে বসে তুমি ওদের অপমান করছ কোন সাহসে? যাও, দূর হও, যাও—

উমা একটিও কথা না ব'লে মাথা নীচু ক'রে বেরিয়ে গেল। অরুণা আর দীপা ঠাকুরদার পায়ের ধূলো নিয়ে এসে ঠাকমার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে।

অভয় দিয়ে ঠাকমা বললেন—ভাবিসনি। আমাদের ভোট কটা তোরা পাবি।

প্রসন্নমুখে ওরা দুজন এবাড়ী থেকে বেরিয়ে অন্য বাড়ীতে গিয়ে ঢুকল।

॥ সাত ॥

ভোটপর্ব চুকে গেল। ফলাফল দেখে সবাই অবাক। সকলের তাক লেগে গেছে। অন্যের কথা দূরে থাক, নরেশকুমার নিজেই এতটা আশা করেননি। তাঁর দল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছে। যাঁরা ভেবেছিলেন, শশাঙ্কশেখর অন্ততঃ জিতবেনই, তাঁরা খুব বেশী অবাক হলেন। অনেকে বলাবলি করল, শশাঙ্কশেখর স্বাধীনভাবে দাঁড়ালে এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হ'ত না তাঁকে।

অরুণার আশ্চর্য দূরদৃষ্টি। অবস্থাটা ঠিকই অনুমান করেছিল। কথাপ্রসঙ্গে সুধীরকে সে এ বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিয়েছিল। সুধীর আর তার দল ছিল পুরোপুরি যাকে বলে ওভার স্যাংগুইন। তার নিশ্চিত ফল হাতে হাতে পেল। আট নম্বর ওয়ার্ডে ইউ. পি. বির হ'ল শোচনীয় পরাজয়।

সমর্থকরা মুষড়ে পড়ল। কেউ বলল—শ্যামনগরের মানুষগুলোর কি বিচিত্র মতিগতি। সমস্ত আশ্বাস ব্যালট বাক্সের ভেতর থেকে বঞ্চনার আকারে বেরিয়ে এল। হাজার হাজার সমর্থক ভোটের দিনেই বুঝি মন পরিবর্তন ক'রে নিলে ক্ষমতাবানদের নিষ্ঠুর চক্রান্তে। সাধারণ মানুষ বিচার ক'রে দেখল না, এ চক্রান্ত কাদের। ভোট দিতে এসে তাদের দুর্ভোগের জন্যে দায়ী কারা।

মার্চ মাসে নির্বাচন। বেলা আটটা থেকেই অসহ্য রোদের তেজ। বিরাট লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাররা অধৈর্য হ'য়ে পড়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'একজন বৃদ্ধ আর রুগ্না স্ত্রীলোক সংজ্ঞা হারালেন। খবর রটে গেল, ইউ. পি. বির গাফিলতির ফলেই এটা হ'য়েছে। পৌরসভার ভাইস্‌চেয়ারম্যান তখন দেবব্রত বিশ্বাস। ইউ. পি. বির লোক। কেন তিনি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সুব্যবস্থা করেননি। এই যদি এঁদের কাজের নমুনা হয়, তাহলে এদের ভোট দিয়ে লাভ কী।

সংজ্ঞাহীনদের চিকিৎসা করলেন একজন ডাক্তার প্রার্থী। ডাঃ অমল মুখার্জী। বয়সে খুবই নবীন। ডাক্তারীতে নতুন পশার হ'য়েছে।

অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার। গ্রামবাসীর শ্রদ্ধা ভালবাসা আকর্ষণ করেছেন গরীব দুঃখীর স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা ক'রে। বহুক্ষেত্রে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করে দেন তিনি। যাঁদের পয়সা দেবার সামর্থ্য নেই।

তাবৎ ভোটার দেখলেন, সংজ্ঞাহীনদের দেখে শশাঙ্কশেখর যখন অস্থিরভাবে পদচারণা করছেন, ডাক্তার তখন কাজের কাজ ক'রে চলেছেন। তাঁর তাবুতে আগে থেকেই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ছিল। রোগীদের তাঁবুর ভেতর নিয়ে গিয়ে বিধিমত চিকিৎসা করলেন।

ব্যস, একজনের গুরুত্ব যথার্থ অনুধাবন করবার জন্যে এই ঘটনাই যথেষ্ট। ব্যালট পেপারে ডাক্তার আর তাঁর জুটিদের নামের পাশে ঢ্যারা পড়তে লাগল একের পর এক। গ্রামের লোককে বিস্মিত ক'রে শশাঙ্কশেখর শোচনীয় ভাবে হেরে গেলেন। ইউ. পি. বির অপর প্রার্থী সম্পর্কে অবশ্য বিশেষ আশা কেউ পোষণ করেননি। সুবিনয়ের জামানত বাজেয়াপ্ত হতে হতে সামান্যের জন্যে বেঁচে গেল। সকলের বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন দেখা গেল নরেশকুমারের চেয়ে বহু ভোটের ব্যবধানে ডাক্তার প্রথম হয়েছেন। নরেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

জয়-পরাজয় ভাগ্যের খেলা। পুরুষকার সময়ে সময়ে স্থাণু হয়ে পড়ে ভাগ্যের কাছে। এ পরাজয়ে মনে ক্ষোভ হলেও বাইরে প্রকাশ করেন নি শশাঙ্কশেখর। কর্ণের মতই তাঁর মনে হ'ল, চিরদিন তিনি নিষ্ফলের, হতাশের দলেই থাকবেন। সাধ্যমত তাঁদের সেবা করবেন। জনসাধারণের রায়ে তিনি হেরেছেন বলে তাঁদের ওপর বিশ্বাস হারাতে কোনদিনই পারবেন না। মানবতার পূজারী তিনি। মানুষের কাছ থেকে কিছু পেয়ে তবে কিছু দেবেন, এই মনোভাবের প্রশ্রয় তাঁর কাছে নেই।

শুধু একটি কথা ভেবে দুঃখ হয়েছিল শশাঙ্কশেখরের। নলিনী শত সাধ্য সাধনাতেও ভোট দিতে আসেনি। যে জিদ একবার সে করে বসবে তার থেকে তাকে টলায় কার সাধ্য।

সুধীর সত্যি মুষড়ে পড়েছিল। ব্যক্তিগত পরাজয়ের জন্যে সে তত দুঃখিত নয়। তার দুঃখ সংগঠনের দুর্দশায় দীর্ঘদিন জনসাধারণের অক্লান্ত সেবা করে সে প্রমাণ করেছিল তার সাংগঠনিক ক্ষমতা। প্রচণ্ড ধাক্কায় ধ্বসে পড়ল তার কল্পনার সৌধ। এই ক্ষতিকে মেনে নিতে সে পারছিল না কিছুতেই।

ভোটের ফল গণনা চলেছিল সারা রাত, পরের দিন বেলা আটটা পর্যন্ত। নরেশ রাত্রি বারোটা অবধি ছিলেন। শরীরটা খারাপ বোধ হওয়াতে চলে এসেছিলেন। পরদিন সকালে উমা গিয়ে তাঁকে ফলাফল জানালো। আনন্দের আতিশয্যে নরেশ উমাকে একেবারে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

উমা নরেশের শোবার ঘরে সোজা চলে এসেছিল। নরেশ তখনো বিছানায় শুয়ে। খাটের ওপর পুরু গদীতে পাতা ধবধবে বিছানা। মাথার নীচে দুটো বালিস। পাশ বালিসটাকে আঁকড়ে পড়েছিলেন নরেশ। অনেক রাত্রে ফিরেছেন। রাত্রেও দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুমুতে পারেননি। উঠি উঠি করেও উঠতে ইচ্ছে করছিল না। মাসখানেক ধরে অসহ্য ধকল গেছে শরীরের ওপর। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা অনুভব করছিলেন নরেশ। কেমন যেন জ্বর জ্বর ভাব।

বেলা আটটা বেজে গেছে। সকালে একজন এসে তাঁকে তখন পর্যন্ত গণনার ফল জানিয়ে গিয়েছিল। ডাঃ মুখার্জী আর তিনি অনেক মার্জিনে জিতছেন। তাঁর দলের আর দুজন ইউ. পি. বি প্রার্থীর কাছাকাছি যাচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই। ফিফ্‌টি পারসেন্ট সিওর সাক্‌সেস। এটা বড় কম কথা নয়।

বিছানায় গড়াগড়ি দিতে দিতেই তাঁর একজন সমর্থকের কথা শুনছিলেন নরেশ। খবর শুনিয়ে খুশীমনে সে চলে গেল। নরেশ কিন্তু খুশী হতে পারলেন না। সেন্ট পারসেন্ট ভিক্টরী চাই। তা নইলে মান থাকবে না।

বাড়ীর রাঁধুনী, ঝি, চাকর, ছেলে মেয়ে, বউ সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। সুতপা একবার ঘরে ঢুকেছিল কি একটা কারণে।

বাবাকে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বলল—এখনো শুয়ে আছ কেন বাবা। শরীর খারাপ নাকি? ভোটের ওখানে যাবে না?

নরেশ জবাব দিলেন—শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না। পরে যাব।

—ডাক্তারকে খবর দিতে বলি?

—না, না, তার দরকার নেই!

সুতপা কাছে এসে বাবার কপালে হাত রাখল। তারপর বললো—মাথাটা টিপে দোব বাবা?

—না, তুমি পড়োগে। পরীক্ষা সামনে।

সুতপা কপালটায় বার কতক হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল। বেশ আরাম লাগছিল নরেশের। মাথাটায় যন্ত্রনা হচ্ছিল।

চোখ বুজে বিছানায় পড়ে রইলেন তিনি। বড় ওয়াল ক্লকটায় ঢং ঢং করে আটটা বাজল। ঘরের এককোণে রাখা ফুলদানীতে রজনীগন্ধার ঝাড়। সুমিষ্ঠ গন্ধ ভেসে আসছে সেখান থেকে।

অনেকক্ষণ থেকেই উঠি উঠি করছিলেন নরেশ। একবার উঠতে গিয়ে মাথাটা ভার ভার বোধ হ'ল। ওঠা দরকার। গণনা বোধ হয় শেষ হয়ে এল। ওখানে একবার যেতে হবে। তাঁর সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আসা উচিত। কিন্তু উঠতে পারলেন না তবু। আবার শুয়ে চোখ বুজলেন তিনি।

এমন সময়ে আনন্দের উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে উমার সেই ঘরে প্রবেশ। মুষ্টিবদ্ধ এক বাহু উর্ধ্বে তুলে উমা অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল—থ্রি চিয়ার্স ফর নরেশ ব্যানার্জী। হিপ, হিপ হুররে।

উচ্ছ্বাস জিনিষটা বোধ হয় সংক্রামক। মুহূর্তে নরেশের শারীরিক অবসাদ কোথায় দূর হয়ে গেল। আনন্দে জ্বল্ জ্বল করে উঠল তাঁর মুখখানা। কপিশরঙের চক্ষু তারকা থেকে খুশী যেন উপচে পড়ছিল। গোঁফ বিহীন মুখখানায় ফুটে উঠল একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি। এগিয়ে এসে উমাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

—তুমি আমাদের জেতাবার জন্যে যথেষ্ট করেছ উমা। তোমার সাহায্য না পেলে—

—তাতেও একই ফল হত। উমা নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে।

—কেমন করে?

—মানুষ হিসেবে মানুষকে যতদিন না বিচার করা হবে, ততদিন শশাঙ্কদা'রা হারতে বাধ্য। ওদের প্রতিপত্তি, অর্থ, পশার, কোনটিই নেই। লোকে জানে ওরা ভাল কর্মী। তাই ওদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে। ওদের দিয়ে কাজ গুছিয়ে নেয়। কিন্তু ক্ষমতার আসনে বসাতে চায় না কোনদিন।

—বল, ওদের দায়িত্ব নেবার ক্ষমতাই নেই।

—না, তা আছে। আমার মনে হয়, ওদের ক্ষমতা দিলে অকেজো হয়ে যাবে বলে লোকের সন্দেহ। গদীতে বসবে ক্ষমতাবানেরা, কাজ করবে ওরা, নিঃস্বার্থভাবে।

—ওসব কথা থাক। তোমায় আমি পুরস্কৃত কর্বো বলেছিলাম মনে আছে?

—আছে।

—কি নেবে বল।

—ভেবেচিন্তে বলতে হবে।

—বেশ, তাই বোলো। চেয়ো যা তোমার খুশী।

প্রথমতঃ মিউজিক এ্যাণ্ড ড্যান্স স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নরেশ প্রচুর দৌড়োদৌড়ি করেছেন। ইলেকসানের জন্যেও ধকল কম হয়নি। সুখী মানুষ। এত ধকল সহ্য করার মত তাঁর পাকা-পোক্ত শরীর নয়। জ্বরে পড়ে গেলেন। নেহাৎ ছোটখাট নয়। প্যারাটাইফয়েড।

উমা যদিও সুতপার সেতারের গৃহশিক্ষিকা, তবু সম্পর্কটা এতদিনে প্রায় বাড়ীর লোকের মত হয়ে গেছে। এ বাড়ীতে তার জন্যে দ্বার অবারিত; যখন তখন। উমা সুতপার কাছে

নরেশের জ্বরের কথা শুনল সেদিন। মুখে একরাশ চিন্তার ছাপ নিয়ে সে নরেশের বিছানার পাশে গিয়ে বসল। স্নতপাকে সেতার শিখিয়ে বাড়ী ফেরার মুখে।

নরেশ চোখ বুজে শুয়েছিলেন। মুখখানা তেলা তেলা। চুল-গুলো মুখের কাছে এসে পড়েছে। চাদরটা সরে গেছে গা থেকে। উমা তোয়ালে দিয়ে মুখখানা মুছিয়ে দিল। চুলগুলো সুবিন্যস্ত করে দিল হাত দিয়ে। চাদরটা গায়ে টেনে দিল। টেবিলের ওপর থেকে থার্মোমিটারটা এনে ঝাড়তে ঝাড়তে বললো—জ্বর বাধিয়ে বসলেন শেষকালে ?

নরেশ চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন উমার পানে। ওর এই সেবাটুকু খুব ভাল লাগছিল। আনন্দের একটা শিহরণ অনুভব করলেন সারা শরীরে। ম্লান হেসে বললেন—তোমার সেবার লোভে।

বগলে থার্মোমিটারটা দিতে দিতে উমা বললো—সেবা আপনি না চাইতেই পাবেন, শুধু আমি বলে কথা নয়। কিন্তু ভুগতে হ'চ্ছে তো আপনাকে।

—শরীর থাকলেই ব্যাধি থাকবে। সারিয়ে তোল দেখি

—আমি তো ডাক্তার নই।

—শুধু অষুধে রোগ সারে না, সেবা চাই।

—সেবা করার লোকের আপনার অভাব কী ?

—তা নেই। অন্ততঃ তুমি থাকতে।

জ্বরটা একভাবে চলছিল। ডাঃ মুখার্জী আসছেন দুবেলা। প্রত্যহ অষুধ দেন। বলেন,—ভয় নেই নরেশদা, সেরে যাবেন শীগ্গীর।

উমা ঘরেই থাকে। স্নতপাও থাকে সে সময়। ডাঃ মুখার্জী উমাকেই বুঝিয়ে দেন, কখন কোন অষুধটা খাওয়াতে হবে। কখন কখন টেম্পারেচার রেকর্ড করতে. হবে। কোন টাইমে কি পথ্য

খাওয়াতে হবে। উমা শোনে মনোযোগ দিয়ে। ঘড়ি ধরে কাজ করে তাঁর নির্দেশ মত।

কয়েকদিন পরের কথা। আজকাল উমার বাড়ী ফিরতে রাত্রি এগারোটা সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। মা রাগ করেন খুব। বকাবকি করেন। পাড়ার লোকের নিন্দে শুনতে হয় তাঁকে। নরেশের সঙ্গে উমার মাখামাখি নিয়ে কানাঘুসো করে সকলে। মার সহ্য হয় না।

সেদিন রাত বারোটা বেজে গিয়েছিল উমার ফিরতে। মা ঠায় বসেছিলেন। হাঁড়ী-হেঁসেল তোলা হয়নি। ওকে দরজা খুলে দিতে হবে। ঠায় বসে বসে দশটা, এগারোটা, বারোটা বেজে গেল। ভয়ানক রাগ হলো তাঁর। না, মেয়েকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে তার ক্ষতি করছেন তাঁরা। পাড়ার লোকের রটনা মিথ্যে নয়। উমার ওপরের বোন দুটো বাড়ীর বার হয় না। তাদের জন্যে আজ পর্যন্ত কোন নিন্দে শোনেননি তিনি। উমার জন্যেই তাঁর যত জ্বালা। না, অমন মেয়েকে বাড়ীতে আশ্রয় দেবেন না তিনি। বাড়ীতে থাকতে হলে বাড়ীর নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে। তা যদি না মানো, সোজা পথ দেখ। এমনিতেই বাপ মার মুখ পুড়ছে। না হয় ভাল করেই পুড়বে।

একা একা বসে নিজের মনেই রাগ করে চলেছিলেন উমার মা। ছেলে মেয়েগুলো ঘুমিয়েছে সবাই। কত্তাও ঘুমিয়েছেন। বৈঠকখানা ঘরে তিনি শোন। উমা কখন আসে টের পাননা।

দরজায় ঠক ঠক করে আওয়াজ হলো। এতক্ষণে আসার সময় হয়েছে মেয়ের। সোজা হয়ে বসলেন উমার মা। ভদ্রঘরের মেয়ের এমন চালচলন হওয়া উচিত নয়। মেয়েকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। তা বলে ,নিজের মুখ পুড়িয়ে বেড়াবে, বংশের মুখে কালি দেবে, এ সব অনাচার সহ্য করবেন না তিনি। আজ বাড়ী ঢুকতে দেবেন না। বাকী রাতটুকু বাইরেই কাটাক।

দরজায় কড়া নেড়ে চলেছে উমা। উমার মা উঠলেন। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। দরজাটা দরাম করে খুলে খিঁচিয়ে উঠলেন—পোড়ার মুখী, লজ্জা ঘেন্না তোর কিছু নেই?

—না মা, নেই। বলে ঢুকতে যাচ্ছিল উমা।

বাধা দিয়ে উমার মা বললেন—রাত আর কতটুকুই বা আছে। যে চুলোয় ছিলি এতক্ষণ, সেই চুলোয় গিয়েই বাকী রাতটা কাটিয়ে আয়।

—কি বলছ মা?

—ঠিকই বলছি। তোর নিন্দেয় যে পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেছে সে খবর রাখিস? দিনের বেলায় বেরুস কী করে ওই মুখ নিয়ে?

—সরো মা। ওই সব আজে বাজে কথা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাওগে, আমি মাথা ঘামাতে চাইনে। আমি নতুন কিছু করছি না। বলে উমা প্রায় মাকে ঠেলে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

উমার মা অগত্যা মনের রাগ মনেই পুষে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। কাপড়টা ছেড়ে আলনায় পাট করে রাখলো উমা। সায়া, ব্লাউস আর টাইট ব্রেষ্টটা খুলে রাখলো ঠিক করে। বিকেলের ছাড়া কাপড়খানা জড়িয়ে গিয়ে ঢুকলো বাথরুমে। বেশ আরাম করে সাবান মেখে গা ধুয়ে নিলে। জলের এখন অভাব নেই। নরেশের জন্যে বাড়ীতে কল এসে গেছে। গা ধুয়ে এসে কাপড় ছেড়ে রান্নাঘরে গেল। তার জন্যে ভাত ঢাকা থাকে। ভাত আর সামান্য একটু ঝোল ঝোল তরকারী। উমা তাই গোগ্রাসে গিলতে লাগল তৃপ্তির সঙ্গে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। সমস্ত ভাতগুলো নিঃশেষ করেও মনে হল, খিদে মিটল না। ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে বাকীটুকু পূরণ করে নিলে।

তারপর নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্যদিন শোওয়া মাত্র সে ঘুমে ঢলে পড়ে। আজ চোখে ঘুমের দেখা নেই। সত্যি, ভয়ানক রাত হয়ে গেছে। নরেশেরই দোষে। সবে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন। সকাল সকাল আসতে চায় উমা

নানান অজুহাতে আটকে রাখেন নরেশ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাল গল্প করে কাটিয়ে দেন। উঠতে গেলেই নরেশ চেপে ধরেন তার হাতখানা।

আরোগ্য হবার কদিন পরেই নরেশ আবার পুরস্কারের কথা তুলেছিলেন। উমা পাশ কাটাতে চেয়েছিল। আজ তিনি এক কাণ্ড করে বসেছেন। সুন্দর এক জোড়া সোনার বালা উপহার দিয়ে বসলেন তাকে। উমার মন কিন্তু কিন্তু করছিল। নরেশ জোর করে বালাদুটো তার হাতে পরিয়ে দিলেন।

আসবার সময় বালাদুটো খুলে নিয়েছিল উমা। বাড়ীর কাউকে সে একথা জানাবে না। তাকে ভালবেসে দিয়েছেন নরেশ। নিতে সে চায়নি। জোর করে পরিয়ে দিয়েছেন। গয়নার আকর্ষণ সে কোনদিন অনুভব করেনি। বাঁহাতে একটি মাত্র রিষ্টওয়াচ, তাছাড়া হাত তার খালি। চক চকে সুদৃশ্য বালা জোড়া দেখে তার সুপ্ত কামনা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ঐশ্বর্যের চাকচিক্য ভুলিয়ে দিল তার বঞ্চিত সত্বাকে। ঐশ্চর্য যেন তার অনিচ্ছুক সত্বাকে প্রলুব্ধ করে কাছে টানতে লাগল ভোগের লালসায়। ঐশ্বর্য আর নারী চিরকাল পরস্পর পরস্পরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে।

নরেশ যখন জোর করে তার হাতদুটো টেনে নিলেন বালা পরিয়ে দেবার জন্যে, তখন সে আর আপত্তি করেনি। নরেশের ইচ্ছের ওপরই ছেড়ে দিলে নিজেকে। অলঙ্কারের স্পর্শে সমস্ত শরীর যেন কি এক অজানা পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বিশ্রামকুঞ্জের নির্জন কক্ষে উমার হাতে বালাদুটো পরিয়ে দিলেন নরেশ। কপিশরঙের চোখের দৃষ্টি উমার মুখের ওপর। আবেশে তাঁর চোখ যেন ঢুলু ঢুলু। ভাঙ খেলে যেমন হয় মানুষের। নির্জন মুহূর্ত, অলঙ্কারের শীতল স্পর্শ আর পুরুষের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উত্তেজিত হয়ে উঠল উমা। রক্ত যেন দাপাদাপি করতে সুরু করল। তার নিঃশ্বাসেও গরম হলকা। উত্তেজনায় ওঠানামা করতে লাগল বুকখানা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নরেশ তার পানে তাকিয়ে

রয়েছেন দেখে দৃষ্টি নামিয়ে নিল উমা। মৃদুস্বরে জিগ্যেস করল— কি দেখছেন অমন করে? নরেশ মৃদুহাস্যে একখানা হাত রাখলেন উমার বুকের নরম মাংসের তালের ওপর। সুউন্নত, সুতীক্ষ্ণ। মুঠোর মধ্যে থেকে উপচে পড়ছে যেন। তার গভীর কোন্ অতলে হৃদপিণ্ডের দ্রুত লয় স্পন্দিত। সেটুকু স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন নরেশ। উমাকে বুকের কাছে টেনে বললেন—বিনা অলঙ্কারে মেয়েদের মানায় না। এবার তোমাকে মেয়ে মেয়ে দেখাচ্ছে।

—এতদিন আমাকে পুরুষ ভাবতেন বলে তো মনে হয় না।

নরেশ তাঁর কপিশরঙের চোখের দৃষ্টি উমার মুখের ওপর নিবদ্ধ করে হাসলেন। বোকা বোকা হাসি। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন —তোমাকে আমার ইয়ে—মানে—

—থাক, বুঝতে পেরেছি। এই বয়সে আর প্রেমের কথা শোনাবেন না। স্থূল প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে নিন। ভূমিকা করার বয়স পার হয়ে গেছে আপনার।

রাত্রি বারোটা বাজল। বিশ্রামকুঞ্জ থেকে স্খলিত চরণে বেরিয়ে এল উমা। আসবার আগে নরেশকুমার আবার বোকার মতো হেসে জিগ্যেস করলেন—তুমি এতে রাগ করলে না ত উমা?

জবাব না দিয়েই চলে আসছিল উমা। নরেশ হাতদুটো ... পরিতৃপ্তির সুরে বললেন—ভেবোনা, এই বালা জোড়াই তোমার উপযুক্ত উপহার। আমার বিশ্রামকুঞ্জটা তোমার নামেই লিখে দোব। বাড়ীর অধিকারশুদ্ধ মিউজিক স্কুলের তুমি হবে সর্বময়ী কর্ত্রী।

বিছানায় পাশ ফিরে শুলো উমা। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। ঘুম আসতে চাইছে না কিছুতে। শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছেন নরেশ। অসহ্য জ্বালা। ঘুমুতে না পারলে এ জ্বালার হাত থেকে রেহাই পাবে না।

সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল উমা।

॥ আট ॥

খুব ভোর ভোর কাজে বেরিয়ে যান নীরেন। স্ত্রী তখনো শয্যা ত্যাগ করেন না। আজকাল তাঁর শরীর একেবারে ভালো যাচ্ছে না। বিধবা ননদ উঠে চা করে দেন এক কাপ। খালি পেটে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে পড়েন নীরেন।

ইদানীং তাঁর মেজাজ আরো রুক্ষ হয়ে উঠেছে। নিজেরই একগাদা ছেলেমেয়ে। তার ওপর বোনের সংসারের বোঝাও বইতে হচ্ছে। কলের সামান্য আয়ে সকলের পেট ভরা আহার জুটোতে তাঁর ক্ষমতায় কুলোয় না। ইংরেজ আমলে মিল থেকে ছু'পয়সা উপরি আয় হত। বদলি কাউকে কাজ দিলে বাড়ীতে টাটকা ইলিস কিম্বা দশ-বিশ টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে যেত। চল্লিশ টাকা মাইনেতে হেসে খেলে নির্ভাবনায় দিন কেটেছে। মিলের মালিকানা মাড়োয়ারীদের হাতে আসতে চাকা ঘুরে গেছে। উপরি আয়ের পথ একেবারে বন্ধ। লেবার অফিস হয়েছে মিলগুলোতে। ওদের হাতেই লোক ভর্তি করার কলকাঠি। ডিপার্টমেন্টের বাবুদের কোন হাত নেই। যা করবেন লেবার-অফিসার।

সাহেবরা বাঙালী বাবুদের খাতির করতো কত। কাজের লোকের কদর জানত তারা। এখন অবাঙালী ওপরঅলারা বাঙালীবাবুদের সুনজরে দেখে না। দায়িত্বপূর্ণ পদগুলোতে এনে বসিয়ে দিচ্ছে অযোগ্য লোকদের। সই করতে গেলে যারা কলম ভেঙ্গে ফেলে। জাত ভাই হওয়া ছাড়া যাদের আর কোন যোগ্যতা নেই।

নীরেনের মুখে এই সব কথা প্রায়ই শোনা যায়। কাজকর্ম কেমন চলছে কেউ জিগ্যেস করলেই বলেন—আর ভাই বোলো না,

শালারা আর কাজ করতে দেবে না আমাদের। যত সব গোমুখ্যুদের ধরে এনে সেক্রেটারী, স্পিনিং-মাষ্টার, উইভিং-মাষ্টার, সুপারভাইজার বানিয়ে দিচ্ছে আর আমরা যে-কে সেই। তিরিশ বচ্ছর কল ঠেঙাচ্ছি, আমরা কিনা কাজ জানিনা। শালার বেটা শালারা।

গঙ্গার ঘাটে গিয়ে যখন নীরেন পৌঁছলেন, তখন পৌনে ছটার ভোঁ বাজল ওপারের চটকলে। নৌকোটা ছাড়ব ছাড়ব করছে। তাঁর জন্যেই মাঝি অপেক্ষা করছিল। তাঁকে দেখেই হাঁক পাড়ল সে। চটিটায় পটাং পটাং আওয়াজ তুলে সিড়িগুলো মাড়িয়ে প্রায় ছুটে এসে নৌকোয় চাপলেন নীরেন।

গঙ্গায় এখন ভাঁটা। এপারের তীর ঘেঁসে উজান ঠেলে নৌকো এগিয়ে চলেছে। পাশে ব্রহ্মময়ীর মন্দির। পূব আকাশে রক্তিমাভা। মন্দিরেব দিকে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন নীরেন। তারপর নৌকোর আরোহীদের পানে চাইলেন ভালো করে। সবাই এসেছে। মিলের বড়মিস্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন—একটা কড়া বিড়ি খাওয়া তো গৌর।

গৌর বিড়ি বার করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে। দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিলে বিড়িটা। তারপর জ্বলন্ত কাঠিটা গঙ্গার জলে ফেলে দিলে। ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল নীরেনের। বিড়িতে বেশ করে একটা সুখটান দিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে গৌরকে বললেন—আজ হপ্তা উঠিয়ে গোটা দশেক টাকা দিস ত গৌর।

—নেবেন। একটু পরে মিস্ত্রী জিগ্যেস করলো—আজ আপনার কি একটু সময় হবে?

—কেন রে?

—একখানা দরখাস্ত লিখিয়ে নোব।

—বেশ, হপ্তা উঠিয়ে নিয়ে যাস। লিখে দোব।

মিলে গিয়ে ঢুকলেন ছটার ভোঁ বাজল। নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন নীরেন। সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেলেন কাজের মধ্যে।

সাড়ে এগারোটায় মিল থেকে বার হলেন। মাথায় এক গাদা চটের ফেঁসো মেখে। মাথাটা ঝেড়ে আসবার দরকার মনে করেন না নীরেন।

দশটা টাকা ধার করেছেন। সংসারে এটা নেই, সেটা নেই শুনে এসেছেন। মুদীর দোকানে টাকা কটা দিয়ে মাল আনবেন।

এই সময়ে যদি সুধীর ছ'পয়সা রোজগার করে আনত, তাহলেও কিছুটা উপকার হত। পরের ছেলে হুটো নাইন, টেনে পড়ছে। তাদের রোজগার করে আনার এখনো অনেক দেরী। মেয়েটা বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। নীরেন তার বিয়ে দেবার কথা আর ভাবেন না। ধীরেন যদি পুঁজিপাটাটুকু হাতিয়ে নিয়ে না যেত, তবে হয়ত এ্যাদ্দিনে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিতেন।

নীরেন প্রত্যহ সুধীরকে গালমন্দ করতে ছাড়েন না। তবু এ ক'মাস ইলেক্‌সানে মেতেছিল ব'লে কিছু বলেননি। ছেলে যদি কমিশনার হয় তো মন্দ কী। মানও আছে পয়সাও আছে। নিজের চোখেই দেখেছেন, কমিশনার হয়ে এক একজন লাল হয়ে গেল। লোকে বলে, মিউনিসিপ্যালিটি একটা চোরের আড্ডা। কথাটা মিথ্যে নয়। চার আনার রাস্তা বানিয়ে এক টাকা বিল করে। সামান্য একটু সিমেণ্ট পলেস্তারা দিয়ে নর্দমা তৈরী হয়। তার জন্যে মোটা দক্ষিণা নেয় কণ্ট্রাক্টররা। সবটাই তাদের পেটে যায় না। কমিশনারদেরও পকেট ভর্তি হয়।

কাজেই সুধীর যদি কমিশনার দাঁড়ায় তো দাঁড়াক। ওটাও তো একটা ভাল রকমের চাকরী। মান, প্রতিপত্তিও আছে। দশজনে খাতির করবে।

কিন্তু নির্বাচনে সুধীর হেরে যেতে তাঁব সে কল্পনা আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়েছে। আবার তিনি আগের মতই সুধীরকে গালমন্দ করে চলেছেন।

নীরেন বাড়ী পৌঁছলেন বারোটা বেজে যাবার পর। বোশেখ মাস। প্রচণ্ড রৌদ্রে ঝলসে এসেছেন। সুধীরের বোন রেখা তাড়াতাড়ি একখানা পাখা নিয়ে তাঁকে হাওয়া করতে এল। জামাকাপড়টা ছেড়ে দড়িতে মেলে দিলেন নীরেন। হাত পাখা-খানা রেখার হাত থেকে নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলেন। রেখা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে একটা চিরুনী এনে বাবার হাতে দিল। অনেকক্ষণ ধরে কদম ছাঁট চুলের ভেতর চিরুনীটা চালালেন নীরেন। চটের ফেঁসো একগাদা জমেছিল মাথায়। দুবেলা কয়েক মিনিট ধরে চুল আঁচড়ানো তাঁর প্রাত্যহিক কাজ। তারপর বসে বসে তেল মাখলেন নীরেন।

—হ্যারে, নবাবসাহেব কখন বেরিয়েছে বাড়ী থেকে ?

—সেই সকালে কিছু না খেয়ে বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি।

সুধীরের খোঁজ নিচ্ছিলেন নীরেন রেখার কাছ থেকে।

—আমার সঙ্গে তো দেখাই হচ্ছে না নবাব সাহেবের।

কথাটা সুধীরের মার কানে গেল। তিনি জিগ্যেস করলেন—কেন, কি দরকার তাকে ?

নীরেন স্ত্রীর প্রশ্নের ধরন শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

—কি দরকার মানে ? সেই হারামজাদাটা বাপের হোটেলে খাচ্ছেন, দাচ্ছেন আর দেশসেবা করে বেড়াচ্ছেন। আমি তার বাপ হয়ে এমন অপরাধ করেছি যে তার খোঁজটাও নিতে পারব না ?

সুধীরের মা গম্ভীর মুখে কাছে এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় বললেন—তোমার চ্যাটাং চ্যাটাং বচনের চোটে সে তোমার ছায়া মাড়াতে চায় না। তুমি একপেট গিলে, একটা ঘুম দিয়ে যখন বাড়ী থেকে বেরোও, তখন সে চোরের মত বাড়ী আসে। কড়কড়ে দু'মুঠো ভাত, না থাকার মতই একটুখানি তরকারী দিয়ে গপ্ গপ্ করে গেলে। দিনে ঐ একবার। রাত্রে সে কোনদিনই খায় না। যদি [illegible] তো, ঐ দুমুঠোও দোব না আজ থেকে।

নীরেনের রক্ত মাথায় চড়ে গিয়েছিল। চীৎকার করে বললেন—না, দেবে না তাকে। ঐ ছমুঠো খেলে তুমি বাঁচবে।

—থামো তুমি। চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। বলে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন সুধীরের মা।

গামছাটা হাতে নিয়ে স্নান করতে গেলেন নীরেন।

এসে সামান্য একটুক্ষণ জপ করলেন তিনি। এটাও তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাস। নইলে ঠাকুর দেবতার ওপর সত্যিকার ভক্তি-শ্রদ্ধা তাঁর নেই। খাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নেন। ছটো বাজলে কাপড়, জামা পরে আবার বেরিয়ে যান। মুখে পান গুঁজে, ছাতা বগলে তিনি বাড়ী থেকে বেরুচ্ছেন এমন সময় সুধীর ফিরছে। মুখে একমুখ দাড়ি। রংটা পুড়ে কালিবর্ণ হয়ে গেছে। চোখ ছটো গর্তে ঢুকে গেছে। ঘামে জব জব করছে গায়ের ছেঁড়া ময়লা জামাটা। খালি পাছটোয় একহাঁটু ধুলো।

বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল সুধীর। আর কয়েক মিনিট পরে ফিরলে ভাল হত। এই অবস্থায় যদি চেঁচামিচি সুরু করেন তো সেটা খুব প্রীতিপ্রদ হবে না। খিদেয় নাড়ী চোঁ চোঁ করছে। সকাল থেকে চা ছাড়া কিছু পড়েনি পেটে।

—লবাবসাহেবের দেশোদ্ধার হল এতক্ষণে? এবার যাও, বাপের হোটেল খোলা আছে, গেলোগে!

আর দেরী করবার সময় নেই। ওদিকে আবার নৌকো ছেড়ে যাবে। দেরী হয়ে যাবে হাজরে দিতে। চটিতে আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলেন নীরেন।

সুধীর থ' হ'য়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। টেনে টেনে দেহটা যেন বয়ে নিয়ে চলেছে একটা ভারবাহী সত্তা। কেমন একটা মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তার মন। সত্যিই তো, আমার নিজের পেটটা অন্ততঃ নিজে চালাব, এই সামান্য আশাটুকু করা ওঁর পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় নয়। আমি কেমন করে

ওঁর আশা পূর্ণ করবো? আমাকে করতেই হবে। সংসারের প্রতি কর্তব্য আছে আমার। দেশসেবা আর রাজনীতি করার অর্থ মা বাবার মনে দুঃখ দেওয়া নয়। এটা বোঝাতে হবে ওঁদের।

আস্তে আস্তে বাড়ীর ভেতর গিয়ে ঢুকলো সুধীর। মনটা বেশ হালকা হয়ে গেছে। বাবার ওপর একটা ভয়-ভয় ভাব কেটে গেছে যেন। ভেতরে ভেতরে একটা অপরাধ বোধ তাকে সব সময় পীড়া দিচ্ছিল। মনে মনে সংসারের প্রতি কর্তব্য পালন করার কথা ভেবেছে বলে সে যেন বেশ একটা জোর পেয়েছে।

ঘেমো জামাটা সযত্নে খুলে রোদে শুকুতে দিচ্ছিল সুধীর। রেখাকে তেল দিতে হুকুম করল। এমন কর্তৃত্বের সুর তার গলায় তো কোনদিন শোনেননি সুধীরের মা। অগ্নিশর্মা মূর্তিতে বেরিয়ে এসে তিনি বললেন—কে তোর ফাই-ফরমাস খাটবে রে মুখপোড়া? কটা হুকুমের চাকর রেখেছিস বাড়ীতে?

—আচ্ছা, আচ্ছা, তেল আমিই নিচ্ছি, বল কোথায় আছে?

—তেল মেখে কি করবি? রূঢ়কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন সুধীরের মা।

—কেন, চান করব।

—তারপর?

—খাব।

—ভাত নেই। যেখানে চোপর দিন-রাত ঘুরে বেড়াস, এবার থেকে সেখানেই খাস দাস, থাকিস। বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে হবে না তোকে। বলে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকে পড়লেন সুধীরের মা।

অবাক চোখে সুধীর তাকিয়ে রইলো মায়ের যাওয়ার দিকে। অনেকক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল প্রস্তর মূর্তির মত। আজ কোথাও কিছু একটা ওলট পালট হয়ে গেছে। বাবার হৃদয়ে কোনদিন স্নেহের প্রকাশ সে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। বরং তাঁর কথায়, আচরণে অচ্ছিল্যই প্রকাশ পেয়েছে বেশী। কিন্তু

মার কথা আলাদা। তাঁর স্নেহের ধারা সব সময়েই তাদের ওপর ঝরে পড়েছে অকৃপণ দাক্ষিণ্যে। বাবার অনাদর দেখে মা কখনো অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন, কখনো তর্ক করতে শুরু করেছেন তাদের পক্ষ নিয়ে।

কিন্তু আজ মায়ের এমন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল কি কারণে? কেন তিনি এমন কঠিন হয়ে উঠলেন?

আকাশ-পাতাল ভেবে লাভ নেই। একটা কিছু ঘটে গেছে আজ। বাবা নিশ্চয় কড়া হুকুম জারি করে গেছেন, তাকে যেন ভাতের থালা ধরে দেওয়া না হয়। তাই যদি হয়, তো এই অবস্থায় অভিমানে বাড়ী থেকে কি সে বেরিয়ে যাবে নাকি? না, ওসব বালাই তার শরীরে নেই। যারা চিরকাল আদরে মানুষ, না চাইতেই পেয়েছে সব কিছু, অভিমান তাদের অঙ্গের ভূষণ হতে পারে; তার নয়।

রুক্ষ স্নান করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। স্নানটা সেরে আসা যাক। সুধীর দ্রুতপদে গিয়ে পুকুরে নামল। ডুব দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে এসে হাঁক দিল—পিসীমা, ভাত দাও।

পিসীমা বাড়ীতে ছিলেন না। খাওয়া দাওয়া সেরে মুখে দু'খিলি পান গুঁজে তিনি গিয়েছেন পাড়া বেড়াতে।

সাড়াশব্দ না পেয়ে সুধীর কিছুক্ষণ ভেবে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। একপাশে ঢাকা দেওয়া ছিল সামান্য ভাত তরকারী। ঢাকাটা খুলতেই চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুধীরের। এই দানা ক'টার মূল্য তার কাছে এখন পৃথিবীর চাইতেও বেশী। সে তাড়াতাড়ি বসে গপ গপ করে গিলতে লাগল গোগ্রাসে।

বিকেল। জামাটা গায়ে গলিয়ে ফাইলপত্র বগলদাবা করে দেশোদ্ধার করতে বেরিয়ে পড়ল সুধীর। অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে। আগামী শনিবার একটি ঘরোয়া বৈঠক হবে। একজন বিখ্যাত নেতা আসবেন। সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা হবে। নির্বাচনী যন্ত্র এমন বিকল হওয়ার কারণ কী, সে

সম্বন্ধে অনুধাবন করা হবে। প্রতিকারের উপায় বের করে তারা চালিয়ে যাবে আগামী সাফল্যের প্রস্তুতি।

তর্কপঞ্চানন রোড ঘোষাল পুকুরকে গ্রাস করে ডাইনে রেল লাইন বরাবর চব্বিশ নম্বর গেটে গিয়ে বাসুদেবপুর রোডের সঙ্গে মিশেছে। বাঁয়ে বারোয়ারী কালীতলার পাশ দিয়ে গিয়ে মিশেছে ব্যানার্জীপাড়া রোডে।

এই জায়গাটায় সুধীরের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল উমার। বাড়ী থেকে বেরিয়ে বালাজোড়া পরে নিয়েছিল সে। বাড়ীতে কাউকে দেখায়নি। হাতখানা দেখতে দেখতে সে চলেছিল আনমনে। মনে মনে নরেশের কথাগুলো ভেবে হেসে উঠলো সে। বিনা অলঙ্কারে মেয়েদের মানায় না। সত্যিই তাই। তার খালি হাত দুটোর সৌষ্ঠব যেন বহুগুণ বেড়ে গেছে।

আনমনে চলেছিল উমা। হঠাৎ বারোয়ারী কালীতলার মোড়ে সুধীরের সঙ্গে দেখা।

প্রতি মুহূর্তে কাল ছুটে চলেছে বিদ্যুৎগতিতে। তার গতি স্তব্ধ করে কার সাধ্যি। শিল্পীরা সেই অসাধ্য সাধন নাকি করে থাকেন। চঞ্চল কালের গতি অনন্ত মুহূর্তের জন্যে থেমে যায় জীবনের অতি বিরল এক পরম লগ্নে।

অলঙ্কার পরা হাতের শোভা দেখতে দেখতে আনমনে উমা পথ চলছিল। মন ছিল একটি মাত্র চিন্তায় ভরপুর। সে ভিক্ষে নেয়নি নরেশের কাছ থেকে। নরেশ অলঙ্কার দিয়েছেন। সেও সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার দিয়েছে নরেশকে। তার কৌমার্য। এটা পারস্পরিক বোঝাপড়া মাত্র। শুধুমাত্র বিনিময়। কেউ কারো কাছে ঋণী নয়। আরো দেব; আরো নেবও। বাড়ীর সত্ত্ব শুদ্ধ মিউজিক স্কুলের কর্তৃত্ব। বড় তুচ্ছ জিনিস নয়। দেওয়ার চেয়ে নেওয়ার পাল্লাই ভারী হবে তখন। মন তার সেই আনন্দে মশগুল।

মনের সেই বিশেষ অবস্থায় অপর[illegible] বেলায় বারোয়ারী কালীতলার মোড়ে সুধীরের সঙ্গে তার [illegible] স[illegible]ঙ্গে উমার

চিন্তার সমতল ক্ষেত্র ফেটে চৌচির হয়ে গেল। বিরাট একটা ফাটল গ্রাস করে নিল তার এতক্ষণের রঙীন চিন্তাগুলো। উমার জীবনেও এইটি বোধ হয় সেই অনন্ত মুহূর্ত। কালের রথ যেন তার মুখোমুখি এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সুধীরের একমুখ দাড়ি, শীর্ণ চেহারা, খালি পা, ময়লা ছেঁড়া জামা, এক মাথা রুক্ষ চুল—সব কিছু মিলিয়ে একটা করুণ ছবি উমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সুধীর মানুষের জন্যে সহস্র রকমের ত্যাগ স্বীকার করে চলেছে কিন্তু কি পেল তার প্রতিদানে? নিদারুণ ব্যর্থতা। তার যা বুদ্ধি, যে ব্যক্তিত্ব, যে উদ্যম, অধ্যবসায়, তা দিয়ে সামান্য চেষ্টাতেই কি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না? এখানের মিলকারখানায় একটা কেরানীগিরি জুটিয়ে বিয়ে থা করে আর পাঁচজনের মত নির্ভাবনায় সুখে জীবন কাটাতে পারত। সে তা করেনি। নিজের সুখ সংসারের ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ও একটা নেশায় মেতে রয়েছে। সে নেশা ঐশ্বর্যের নয়, দুঃখ বরণের।

উমার কষ্ট হচ্ছিল সুধীরের সব কিছু মিলিয়ে সেই করুণ চেহারার পানে তাকিয়ে। ওদের দলকে ভোটে হারাতে উমা চেষ্টা করেনি। ওদের হারিয়ে কী লাভ হয়েছে তার? আর নরেশের দলকে জিতিয়ে তার কী লাভ হয়েছে?

হয়েছে বৈকি। অলঙ্কার। এই যে, এখনো হাতে ঝক্ ঝক্ করছে। আরও হবে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নরেশ। বাড়ীর স্বত্বশুদ্ধ মিউজিক স্কুলের কর্তৃত্ব।

ছি, ছি, ছি, এর জন্যে তাকে কী মূল্যই না দিতে হয়েছে। উমার মনে হল বালা দুটো যেন ব্যঙ্গ করছে তাকে। হাত দুটো যেন জ্বালা করছে। বৃশ্চিকের অসহ্য দংশের মত। তাড়াতাড়ি বালা দুটো খুলে ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে পুরে নিল উমা।

দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে ততক্ষণ পৌঁছে গেছে উমা। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে সুধীরের পানে চেয়েছিল সে। সুধীর এসে পৌঁছে

গেল ওর সামনা সামনি। এবার একই দিকে যেতে হবে দুজনকে। তর্কপঞ্চানন রোড এইখানেই শেষ।

উমাকে দেখে সুধীরের গতি কমে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। ভাবছিল, উমা এগিয়ে যাক। সে যাবে পেছনে। ইচ্ছে সত্ত্বেও তা হল না। উমার গতির সঙ্গে তার গতি মিলে মিশে এক হয়ে গেল।

পাশাপাশি চলতে চলতে সুধীর গতি বাড়িয়ে দিল সহসা। উমা ডাকল—শোন।

থামতে হ'ল সুধীরকে।

—তোমার এ রকম চেহারা কেন?

ম্লান হাসল সুধীর উমার দিকে চেয়ে। উমা সুধীরের চেয়ে বোধ হয় বড়ই হবে বছর খানেকের। সুধীর জবাব দিল—চেহারার দিকে তাকাবার সময় কোথায় উমাদি?

—কেন, ইলেক্‌সানের ঝামেলা তো গেল। এখন আবার কি এত কাজ?

—কাজের কি শেষ আছে? অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে।

—কেন?

—আসছে শনিবার আমাদের একটা ঘরোয়া বৈঠক আছে। বিখ্যাত নেতা নিখিলেশ গুপ্ত বৈঠকে যোগ দেবেন। সবাইকে খবর দিতে হবে।

—বৈঠকে কি আলোচনা হবে?

কথা কইতে কইতে ওরা পাশাপাশি চলছিল। ডান দিকে কো-অপারেটিভ ষ্টোর। সেখানে খদ্দেরের ভীড়। সেদিকে একবার তাকিয়ে জবাব দিল সুধীর—আমরা কেন হেরে গেলাম, তাই নিয়ে আলোচনা হবে।

হঠাৎ উমা সুধীরকে অবাক করে জিগ্যেস করল—আমি যেতে পারি তোমাদের সভায়?

কো-অপারেটিভ ছাড়িয়ে ওরা সামন্য কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই বাসুদেবপুর রোডে পড়ল। ডান দিকে বাঁক নিল দুজনে। অবাক হ'য়ে জিগ্যেস করল সুধীর—তুমি আসবে উমাদি? 'তুমি' কথাটা খুব জোর দিয়ে সে উচ্চারণ করল। যেন কথাটা তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, আমি। কেন, বাইরের লোককে যেতে নেই নাকি?

—না, সেকথা বলছি না। তবে অপোজিট পার্টির কাউকে মিটিংয়ে যেতে দেবার অনুমতি আমি দিতে পারি না। তাতে আমাদের বৈঠকের সিক্রেসী নষ্ট হবে।

—তুমি ভাবছ, আমি ওদের স্পাই হয়ে যেতে চাইছি?

—কতকটা তাই।

—অ, আচ্ছা থাক তাহ'লে।

উমা ভারত চন্দ্র পথের দিকে বাঁক নিল। সুধীর সোজা এগিয়ে গেল গেটের কাছে। এই পথ দিয়েই সবাই বাড়ী ফিরবে। দেখা হ'লে বৈঠকের খবরটা দিয়ে আসতে হবে।

যেতে যেতে সুধীর ভাবছিল, উমাদি আমাদের বৈঠকে আসতে চাইল কেন? অরুণাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে হবে। তাঁকে বৈঠকে আসতে দেওয়া যায় কিনা সে কথাটাও। অরুণার মতামতের মূল্য দেয় সুধীর। তার দূরদৃষ্টি আছে। অরুণার কথার ওপর কথা বলতে সাহস করবে না কেউ। অরুণাকে কালই জিগ্যেস করতে হবে কথাটা।

॥ নয় ॥

মাসখানেক পরিপূর্ণ বিশ্রাম পেয়েছে অরুণা। ভাল ভাল ওষুধ পড়েছে। পুষ্টিকর খাদ্যও পেটে গেছে। তারই জোরে রাতারাতি তার চেহারা বদলে গেছে। আলাদীনের মায়ার প্রদীপ যেন হাতে পেয়েছে অরুণা। স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়ে গেছে আগের চেয়ে। রং যেন ফেটে পড়ছে। মুখ চোখের গড়ন খুবই সুন্দর তার। পুরন্ত হয়ে তা আরও কমনীয় হ'য়েছে। নিতম্ব হয়েছে ভারী। চমৎকার দেখতে হয়েছে অরুণাকে। এই সেদিনও যারা তাকে দেখেছে রুগ্ন, পাকানো শরীর, বিশীর্ণ মুখ, চোখের নীচে কালি,—আজ তারা অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে ওর পানে।

অরুণাও অবাক হয়। আয়নায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে মুখখানা। অমর সেই ঘটনার পর আর আসেনি। এখন যদি অরুণার এই চেহারা তার চোখে পড়ত, তাহলে সেই খুশী হত সব চেয়ে বেশী। সে না এলেও ভাইকে দিয়ে খোঁজ নিয়েছে অরুণার। ওষুধ, পথ্য পাঠিয়েছে নিয়মিত। নিজে তবু আসেনি।

অরুণার মনে হয়, অমর রাগ ক'রেই আসেনি হয়তো। তার কথায় কান দেয়নি সে। অসুস্থ শরীর নিয়ে ইলেক্‌সানে মেতেছিল। খাটা-খাটনী করেই চলেছিল। অমরের কানে গিয়েছিল সে সব কথা। রাগ ক'রে আসেনি আর।

তাতে অরুণার কিছু আসে যায় না। বরং সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। ইদানীং অমরের গুরুগিরি ভয়ানক মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল অরুণা। ভালবাসার পাত্র যদি সব সময় ভারিক্কীচালে চলেন, দেখা

হ'লেই ভালবাসার পাত্রীর কাছে গুরুগিরি করতে লেগে যান, তাহ'লে তাঁকে আর অন্তরের আসনে বসিয়ে প্রেম নিবেদন করা যায় না। তাঁর আসন টলে ওঠে। তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে মন।

অরুণা স্বাধীনা প্রকৃতির মেয়ে। অমরের সেদিনকার ব্যবহার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হয়েছিল তার কাছেও। এক ঘর লোকের সামনে সেদিন নিজেকে অপমানিত বোধ করেছিল। তার বক্তৃতার মাঝখানে ঝড়ের মতো ঢুকে অমর যে অশোভন ব্যবহার করেছিল তাতে সে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল লজ্জায়। সেদিন প্রতিবাদ ক'রে সভার আবহাওয়াটাকে আরও তিক্ত করতে চায়নি অরুণা। একটিও কথা না ব'লে, মাথা নীচু ক'রে সভা থেকে চলে এসেছিল সে। ঘরে এসে খিল দিয়েছিল। অমরকে ঢুকতে দেয়নি। তারপর আক্রোশে ফুলছিল অরুণা। প্রতিজ্ঞা করল, অমরের গুরুগিরি সে আর বরদাস্ত করবে না।

বরদাস্ত সে করেনি। অমরকে অমান্য করার জন্যেই ও যেন আরো বেশী মেতেছিল ইলেক্‌সানের কাজে। ভোটের ফল বেরুল একদিন। এতদিনের পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলাফল দেখে খুব মুষড়ে পড়ল অরুণা। মাসখানেক ঘরের বাইরে পা দেয়নি আর।

অমর তাকে অযথা মাসখানেক উত্তেজিত করেনি। সম্পূর্ণ বিশ্রাম পেয়েছে। ওষুধ, পথ্য তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছে। রূপ এখন ফেটে পড়ছে অরুণার।

কতদিন বাইরে যায়নি অরুণা। আজ খুব ইচ্ছে করছিল তার, বাইরে একটু বেরিয়ে আসে। বেশী দূরে নয়, কাছেই কোথাও। দীপাদের বাড়ী থেকে একটু ঘুরে এলে কেমন হয়। এই তো কাছেই। পুকুরের ওপারে। তর্কপঞ্চানন বাই-লেনের পাশে।

সাবেক আমলের মিত্তির বাড়ী। অনেকখানি জায়গা জুড়ে

বাড়ীখানা। দেওয়ালের সরু সরু ইটগুলো তার প্রাচীনত্ব ঘোষণা করছে। দেওয়ালে এখানে সেখানে বট, অশ্বত্থ চারা গজিয়েছে। নয়নতারা ফুলের গাছও হয়েছে দেওয়ালে। নীল বর্ণের ফুল ফুটে রয়েছে। অরুণাদের বাড়ী থেকে দেখা যায় স্পষ্ট।

পুকুর থেকে উঠে এক জোড়া হাঁস প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ তুলে চলেছিল মিত্তির বাড়ীর দিকে। মিত্তিরদের হাঁস দুটো। পুকুরে এসে নামা আবার উঠে যাওয়ার সময়টা ওদের প্রায় নির্দিষ্ট। অরুণা ঘর থেকেই দেখে তাদের জলকেলি। আদর, সোহাগ জানানোর রীতি মানুষের মত। বেশ লাগে দেখতে। আবার ঝগড়াও করে। নরম পালকে ঢাকা ডানার ঝাপট তুলে একে অন্যকে তাড়া করে ফেরে। তাও বেশ লাগে।

মিত্তিরদের দেউড়ী পেরিয়ে হাঁস দুটো ঢুকে গেল ভেতরে। অরুণার মনটাও ছটফট করতে লাগল। যে অবস্থায় ছিল, সেই ভাবেই বেরিয়ে পড়ল অরুণা।

গলিতে পা দিতেই সে থমকে দাঁড়াল। সুধীরকে দেখা গেল গলির অপর প্রান্তে। একটা মোটা ফাইল বগলদাবা ক'রে হন হন ক'রে সে এদিকেই আসছে। হাত ইশারা ক'রে থামতে বলল অরুণাকে। নইলে গলির অন্য প্রান্ত দিয়ে অরুণা এতক্ষণ এগিয়ে যেত মিত্তির বাড়ীর দিকে। কাছাকাছি এসে সুধীর প্রশ্ন করল—কোথাও বেরুচ্ছ বোধ হয়?

—হ্যাঁ।

—তা যাও, পরে আসব, কথা আছে।

—কি কথা? বল শুনি।

—একটা পরামর্শ দিতে হবে।

—কি ব্যাপার?

—এখানে বলা যাবে না।

—তাহ'লে ভেতরে এসো।

সুধীরকে নিয়ে অরুণা নিজের ঘরে আবার ফিরে এলো। সে জানে, খুব জরুরী কাজ না থাকলে সুধীর তার কাছে আসে না। সাধারণের কাজ করা খুবই কঠিন। সংগঠনের কাজে নেমে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোনও সমস্যা দেখা দিলে সুধীর সেটা নিয়ে আগে আলোচনা করে অরুণার সঙ্গে। অরুণার মতের সঙ্গে নিজেরটা যাচাই করে দেখে। আরো দু'চার জনকে জিগ্যেস করে। যেটা গ্রহণযোগ্য, সেটাই নেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সে দেখেছে, অরুণার পরামর্শই ঠিক।

সুধীর বসলো অরুণার বিছানার ওপর। অরুণা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, এটা সে অরুণার মনেই গেঁথে দিল যেন। অরুণা বসলো চেয়ার-টায়। সুধীরের মুখোমুখি বসে অরুণা জিগ্যেস করল—বল, শুনি।

—বলছিলাম, কালকের মিটিংয়ের কথা। আমাদের বৈঠকে একটি অবাঞ্ছিত মহিলা আসতে চাইছিল। পরামর্শ করতে এসেছিলাম—

—কিসের পরামর্শ ? তাকে বৈঠকে আসতে দেওয়া চলে কিনা ?

—ঠিক ধরেছ। তোমার কি মত ?

—তার আগে শুনি, সেই অবাঞ্ছিত মহিলাটি কে ? অবশ্য আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি।

—বল দেখি কে ?

—নিশ্চয় উমা।

সুধীর একটু অবাক হলো। কি ক্ষুরধার বুদ্ধি অরুণার। সুযোগ পেলে সে নিখুঁতভাবে রাজ্যশাসন করতে পারত। খানিকটা কৃতিত্ব অমরের বৈকি। সেই গড়ে পিটে তৈরী করেছে অরুণাকে। অরুণার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, বলবার ক্ষমতা আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, আবার কী চাই।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সুধীর বললো—ঠিকই ধরেছ। কাল পথে হঠাৎ দেখা উমাদির সঙ্গে। আমার মুখে বৈঠকের কথা শুনে জিগ্যেস করলো—আমি তোমাদের সভায় যেতে পারি ?

অরুণা একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সুধীরের দিকে। ভারী মজার কথা শুনছে সে। একটু নড়েচড়ে বসে বিস্ময়ের সুরে বললো সে—উমা সত্যি আসতে চাইল আমাদের গোপন বৈঠকে ?

অরুণা আন্দাজ করেছিল মাত্র। সেটাই যে ঠিক, উমাই যে সুধীরের সেই অবাঞ্ছিত মহিলা, সে ব্যাপারে নিঃসংশয় ছিল না সে। এখন দেখল তার আন্দাজই ঠিক। জেনে তার বিস্ময়ের সীমা রইলো না।

অরুণার প্রশ্নের জবাবে সুধীর বললো—হ্যাঁ, উমাদি আসতে চাইছিল। খুব আশ্চর্য ঠেকছে তাই না ?

—তা ঠেকছে। তুমি কি আসতে বলেছ তাকে ?

—না। অতটা রিস্ক আমি নিইনি। যদি শেষে কেউ আপত্তি ক'রে বসে ?

—তুমি ভুল করেছ। বৈঠকে যে কেউ যোগ দিতে পারে। এতে আমাদের ভুল-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা হবে। গোপন শলা-পরামর্শ তো কিছু নয় ? কারও বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রও বৈঠকের উদ্দেশ্য নয়, তাহ'লে ?

—তুমি ভেবেচিন্তে বলছ তো অরুণা ?

—এতে আর ভাববার কী আছে ভাই ?

—ঠিক আছে। তাহ'লে তোমাকে যে একটা কাজ করতে হবে অরুণা।

—কি ?

—উমাদিকে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসতে হবে।

—তুমিই যাওনা কেন ? হ্যাঁ, তুমিই যাও। সেটাই ভালো হবে।

—আমিই যাব বলছ ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আজ বিকেলের দিকে গিয়ে ব'লে আসব।

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল কত সহজে। অরুণার কথাই ঠিক।

বৈঠকে গোপন শলা-পরামর্শ হচ্ছে না। কেউ আপত্তি করবে না এতে। করলেও তাদের বোঝাতে বেগ পেতে হবে না। ফাইলখানা বগলদাবা ক'রে উঠে পড়ল সুধীর।

সুধীর চলে যাবার পর অরুণাও উঠলো। দীপাদের বাড়ী বেড়াতে যাবে বলে বেরুচ্ছিল সে। সুধীর এসে পড়ে বাধা দিলে। তা দিক। সামান্য একটু দেরী হয়ে গেছে বৈত নয়। এখনো বেলা অনেক বাকী। অরুণা আবার ঘরের বাইরে পা বাড়াল।

কিন্তু গলিটায় পা দিতেই আবার বাধা পেল সে। অমর আসছে। বহুদিন পরে হঠাৎ আজ কেন এসে হাজির হ'ল ও? অরুণার ভ্রূ কুঁচকে উঠল বিরক্তিতে। কিন্তু চলে যেতেও পারলো না সে।

অমর এসে গেল কাছাকাছি। সামনেই অরুণা দাঁড়িয়ে। অমর দেখল, অরুণা যেন কোথাও বেরোবার জন্যে পা বাড়িয়েছে। সাধারণ বেশভূষা তার পরণে। তবু এই পোষাকেও যেন তার দিকে তাকান যায় না আর। একি পরিবর্তন অরুণার দেহের? কোথায় ছিল এত রূপ?

আশ্চর্য, এতদিন পরে তাকে দেখেও অরুণার মুখখানা অমন গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন? এতটুকু আনন্দের লেশমাত্র নেই তার মুখে। আগের মত খুশীতে তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠলো না, ঈষৎ হাসিতে বিস্ফারিত হল না অধর। তার বদলে ভ্রূটা কেমন যেন বাঁকা বাঁকা। চোখের দৃষ্টিতে বিরক্তি মেশানো। এ তবে কিসের লক্ষণ? তবে কি দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন হয়েছে?

না, এ বোধ হয় তার ভুল ধারণা। অন্য দিকটাও ভেবে দেখা উচিত তার। এতদিন সে আসেনি। এজন্যে অভিমান হতে পারে অরুণার। দুঃখও হতে পারে। তাই ঠিক। অমর এগিয়ে এসে ওর কাঁধে একখানা হাত রেখে জিগ্যেস করল—

আমাকে দেখে খুশী হলে বলে তো মনে হচ্ছে না অরুণা? কি হয়েছে ভাবে না?

—কিছু জানি। হাত সরান।

—আমার কাছে তুমি লুকোতে পারবেনা—নিশ্চয় তোমার অভিমান হয়েছে?

—অভিমান? কেন? কিসের জন্যে? ব'লে অমরের হাত-খানা ঠেলে সরিয়ে দিলে অরুণা।

সেটা গ্রাহ্য না করে অমর সহাস্যে বলল—আমি এতদিন আসিনি বলে?

—তাতে কিছু আসে যায় না। ভেতরে গিয়ে বসতে ইচ্ছে হয়, বসুন গিয়ে। মা আছে। বলে পা বাড়াল অরুণা।

—তুমি চললে কোথায়?

—বেড়াতে।

—সে কি!

—কেন, অমত আছে বুঝি? অনুমতি নিতে হবে?

—এ তুমি কী সব বলছ অরুণা?

—তাহলে পথ ছাড়ুন। যেতে দিন আমাকে। বলে অমরের পাশ কাটিয়ে হন হন করে চলে গেল অরুণা। অমর দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মত। স্যাঁতসেঁতে গলিটার ভ্যাপসানো গন্ধটা সে এতক্ষণ টের পায়নি। হয়ত অরুণার সান্নিধ্যের জন্যেই। সে চলে যেতেই বিশ্রী গন্ধটা যেন তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেবার উপক্রম করল। মুক্ত বাতাসের আকাঙ্ক্ষায় গলিটা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল অমর। দেখল, অরুণা ততক্ষণে তর্ক-পঞ্চানন বাই-লেনের ভেতরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দীপা বাড়ীতে ছিল না। পিসীমা বসেছিলেন রোয়াকে। ঝি বাসন ধুচ্ছিল, তাই বোধ হয় দেখছিলেন। শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষ। একটি একটি করে থালা পরীক্ষা করে নেবেন। সন্দেহ

হ'লে ঝিকে ডেকে বলবেন—বলি, ও বিশুর মা, এ কেমন ধারা কাজ তোর লা? থালাতে সগ্‌রি লেগে রয়েছে এখনো।.. বলি, চোখের মাথা খেয়ে বসে আছিস না কি? নে, মেজে দে আবার। কায়েতের ঘরের বিধবা বলে কথা! জাত-ধম্মো আর রাখলি না বাছা!

বিশুর মা নিঃশব্দে থালাখানা নিয়ে আবার মেজে দেয়।

অরুণা গিয়ে দীপার পিসীমার পাশে বসে পড়ল। পিসীমা জিগ্যেস করলেন—কি লা, এখানে ধূলোর ওপর বসে পড়লি কেন? এখুনি ঝাঁট পাট দেবে বাছা, তুই ভেতরে গিয়ে বস।

—দীপা আসুক। ততক্ষণ এইখানেই বসি একটু।

—না বাছা, ঘরে গিয়ে ব'স।

—ঘরে একলাটি কেন মুখ বুজে বসে থাকব? তার চেয়ে এখানে বসে আপনার সঙ্গে গল্প করি।

—না বাছা, আমার এখন অনেক কাজ। কথা কইবার একরত্তি সময় নেই। যা বলছি শোন, ঘরে যা। দীপু কি সব কেনাকাটা করতে গেছে দোকানে, এলো বলে।

—তাই বসছি পিসীমা।

অগত্যা অরুণা ঘরে গিয়ে বসল। এটা বিজিতের ঘর। সুন্দর পরিপাটী করে সাজানো। কোরেস কোম্পানীর সুদৃশ্য একটি মাত্র ক্যালেণ্ডার ঘরে। ক্যালেণ্ডারের ছবিটা বড় সুন্দর। দুপাশে ঝাউ-এর সারি। মধ্যে পিচের পথ চলে গেছে সুদূরে। হাতছানি দিয়ে পথিককে যেন ডাক দিচ্ছে সেই সুদূর প্রসারী পথ। ছবিটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অরুণা। তারপর ঘরের আসবাব আর টুকিটাকি জিনিসপত্রের দিকে তাকাল একে একে। খাটের ওপর পরিপাটী করে পাতা ধবধবে বিজিতের বিছানা। লম্বা লম্বা মানুষ সমান দুটো পাশ বালিস। মনে মনে হাসল অরুণা। ঘুমুতে ঘুমুতে যে পাশেই ফিরুক, একটাকে আঁকড়ে থাকতে পারে বিজিত।

এই ঘরে অরুণা দীপার সঙ্গে আগেও ঢুকেছে কতবার। কিন্তু আজ গোধূলি বেলায় একা একজন পুরুষের ঘরে ঢুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যেমন করে সব দেখল, এর আগে তেমন চোখ নিয়ে কোনদিন দেখেনি।

একপাশে একটা চেয়ার টেবিল। টেবিলের ওপর একটা ইলেকট্রিক ল্যাম্প। ডানদিকে কয়েকখানা বই। অরুণা গিয়ে বসল চেয়ারটায়। একখানা বই টেনে নিয়ে পড়তে লাগল। মনটা ঠিক বসছিল না। অমরের মুখখানা ভেসে উঠল বইয়ের পাতায়। একটু রূঢ় ব্যবহার করে ফেলেছে সে। তার মনটা ভেতরে ভেতরে এতখানি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে সে নিজেই জানতে পারেনি। অমরকে দেখামাত্র সেইটাই রূঢ় আকারে প্রকাশ পেয়েছে। হ্যাঁ, ও জানুক, চিরকাল ওর মাষ্টারী সহ্য করবার মত ধৈর্য অরুণার নেই।

তবু অমরের মুখখানাই চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল বার বার। অমর তার কাছে এমন ব্যবহার আশা করেনি কখনো। সে অনেক করেছে তার জন্যে। তার উপকার করেছে যথেষ্ট। অমরের ত্যাগ স্বীকারের তুলনা হয় না। প্রথম দিন থেকেই সে অরুণাকে কি সুনজরে দেখেছিল, কে জানে।

অরুণার ক্ষয়রোগের জন্যে অমরই দায়ী। দায় সে এড়াতে চায়নি। সাধ্যের অতিরিক্ত সে করেছে। অরুণাকে ভালবাসে। তার মঙ্গলের জন্যই অমর সময়ে অসময়ে রূঢ় ব্যবহার করেছে। ছি, ছি, সে কেন এই সহজ কথাটুকু বুঝতে পারেনি। স্বার্থপরের মতো নিষ্ঠুর ব্যবহার করে এসেছে এইমাত্র। অমর কী বলে সহ্য করলো, সেই ভেবে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল সে। এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে মানুষ এমন ব্যবহার করতে পারেনা কখনো।

বইখানা যথাস্থানে রেখে উঠে পড়লো অরুণা। এক্ষুণি যাওয়া দরকার। যদি অমর এখনো তার জন্যে অপেক্ষা করে?

নিশ্চয় সে অপেক্ষা করছে। আর সে কিনা তার মুখের ওপর দশটা কথা শুনিয়ে দিয়ে তার সামনে দিয়েই চলে এসেছে এখানে? কেন এসেছে সে? দীপা বাড়ী নেই শুনেও এখানে সে বসে রয়েছে কেন? বিজিতের ঘরে ঢুকে একলা বসে থাকার কি অধিকার আছে তার?

দীপা কখন আসবে কে জানে। হয়ত বিজিত এক্ষুণি এসে পড়বে। এসে যদি দেখে অরুণা তার ঘরে বসে আছে, তাহলে কী ভাববে সে।

—চল্লাম পিসীমা। দীপা এলে বলবেন আমি এসেছিলাম।

—সে কি লা, চললি কেন, বসনা বাছা. দীপু এলো বলে।

—কাল আবার আসব।

অরুণা দ্রুতপায়ে চলে এল বাড়ী। ঘরের ভেতর ঢুকেই দেখতে পেল অমর বিছানার ওপর আধশোয়া অবস্থায় একখানা বই পড়ছে। বইয়ের পাতায় অমরের মন ছিল না। এতক্ষণ সে ভাবছিল অরুণার খানিক আগের আচরণের কথা। মুখখানা তার থম থম করছে রাগে।

অরুণাকে ফিরতে দেখে বইখানা ছুড়ে ফেলে দিল অমর। বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সোজা বলে উঠল—তোমার মতলবটা কি? হোয়াটস দি আইডিয়া? আমাকে অপমান করার সাহস কোথায় পেলে তুমি?

অরুণা শান্তগলায় বললো—আপনি বসুন। চীৎকার করবেন না। মা ছুটে আসবে।

অমর স্বর আরো চড়িয়ে বললো—আসুন তিনি। তাতে কিছু এসে যাবে না। অবাধ্য মেয়ের দাওয়াই এতক্ষণ তিনিই আমাকে বাৎলে দিচ্ছিলেন। তোমার মত মেয়ের সেই দাওয়াই দেখছি ঠিক।

—কি দাওয়াই?

অমর হঠাৎ দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে এগিয়ে এল অরুণার

সামনে। ঠাস ঠাস করে তার ছ'গালে গোটা কতক চড় কসিয়ে দিলে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে—এই দাওয়াই।

অরুণা হতবাক। মনের মধ্যে অপরিসীম এক বেদনা নিয়ে সে ছুটে এল দীপাদের ঘর থেকে। দারুণ অনুশোচনায় তার মন ভরে গিয়েছিল। প্রতিকারের বাসনা নিয়ে ছুটে এল সে। কিন্তু একি হল? এর নাম প্রেম, ভালবাসা? ভালোবাসা এমন অন্ধ? তা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য করে তোলে মানুষকে এই ভাবে? মনে বিকার এনে দেয় বুঝি! প্রেমিকের এ বিকার সাজে সাজুক। যাকে স্বামীত্বে বরণ করবে, তার এ সাজে না। সারা জীবন এমন মানুষ নিয়ে ঘর করা কখনই সম্ভব নয়। তাদের মিলনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাক। এই মুহূর্তে।

অরুণা অবিচলিত স্বরে বললো—ভাল দাওয়াই বের করেছেন যাহোক। শ্রদ্ধা বাড়ল আপনার ওপব। দেখবেন, ভবিষ্যতে যেন আর কখনো আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ না হয়।

বলেই সেই মুহূর্তে ঘর থেকে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল অরুণা। কিছুক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে মুখখানা কালো করে অমর বেরিয়ে গেল অরুণার ঘর থেকে।

কানে গরম সীসের মত তখনো ঢুকছিল অরুণার কথাগুলো—ভবিষ্যতে যেন আর কখনো আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ না হয়।

॥ দশ ॥

উমাদের বাইরের দিকের উঠোনে জবা গাছটার কাছে একরাশ অন্ধকার যেন ঘাপটি মেরে বসে আছে। বাড়ীখানা নিঃস্তব্ধ। এত লোকজন, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। সুধীর দরজা অবধি এগিয়ে ইতস্ততঃ করছিল ঢুকবে কিনা। উঠোনের দরজাটা ভেজানো ছিল। হাত দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল। সামনেই ভেতরের উঠোনের ওপাশে টালির রান্নাঘর। রান্নাঘরের সামনের রোয়াকে বসে উমার মা তরকারী কুটছিলেন। দরজাটা খুলে যেতেই তাকিয়ে দেখলেন, কে একজন দাঁড়িয়ে।

উমার মা জিগ্যেস করলেন—কে?

সুধীর ভেতরের উঠোনে পা দিয়ে জবাব দিল—আমি সুধীর।

—অ, সুধীর, এসো। উমার মা উঠে সুধীরের কাছে এগিয়ে গেলেন। কি খবর বাবা?

—উমাদি বাড়ীতে আছে?

—আছে। জ্বর হয়েছে, শুয়ে আছে ঘরে। নরেশ দেখতে এসেছে। যাও না তুমি।

—নরেশ কাকা এসেছেন? তাহ'লে এখন থাক। পরে আসব।

—নরেশ এসেছে তো কী হয়েছে? তুমি দেখা করতে এসেছো, ফিরে যাবে কেন?

—না, না, আমার তেমন জরুরী কিছু—

—না বাবা, এসেছ যখন, কাজটা মিটিয়েই যাও।

উমার মা কতকটা জোর করেই যেন রাজী করালেন সুধীরকে। সুধীর এই পেড়াপীড়ির অর্থ বুঝতে পারল উমার ঘরে পা দিতেই। ঘরে মৃদু হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে এক কোণে।

অন্যদিকে মেঝের ওপর পাতা বিছানায় শুয়ে আছে উমা। নরেশ বসে আছেন একেবারে উমার গা ঘেঁসে। ঘরে ঢুকতেই সুধীরের মনে হল, তাঁর হাতখানা যেন উমার দেহে ইতস্ততঃ ঘোরা ফেরা করছিল। তার পদশব্দে থেমে গেল হাতখানা। ঘরের মধ্যে কেউ অতর্কিতে প্রবেশ করবে, ভাবতে পারেননি নরেশ। হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে পেছনে না তাকিয়েই নরেশ অবস্থাটাকে মানিয়ে নেবার জন্যেই যেন বলে উঠলেন—কেমন বোধ কবছ এখন? গা-তো গরম দেখছি না।

সুধীর এগোবে না পিছিয়ে আসবে ঠিক কবতে পারছিল না। উমা বালিশ থেকে মাথা তুলে দরজার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলো—কে?

অগত্যা সুধীর এগিয়ে গেল।

—আমি সুধীর।

—এসো, এসো। কিছু দরকার আছে বুঝি? তারপর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই নবেশকে বললো—আপনি একটু সরে বসুন, সুধীরকে বসতে দিন।

নরেশ একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আমি এখন তাহলে আসি কি বল উমা? পরে আবার আসা যাবে।

—আচ্ছা আসুন।

সুধীরের অপ্রত্যাশিত আগমনে মনে মনে বিরক্ত হ'য়েছিলেন নরেশ। হঠাৎ ওব আসার কোন কারণই খুঁজে পেলেন না তিনি। এ বাড়ীতে কোনদিন বড় একটা আসতেও দেখেন না সুধীবকে। সুধীর না এলে এত শীগ্‌গীর তিনি নিশ্চয়ই যেতেন না। নরেশ বিরক্ত হ'লেন আর একটা কারণে। তিনি দেখলেন, সুধীর আসতেই উমা তাকে আপ্যায়িত ক'রে বসালো। উমার পাশের সব জায়গাটুকু অধিকার ক'রে বসেছিলেন তিনি। উমা তাঁকে সরে বসতে বললো। জায়গা দিতে বললো সুধীরকে। মনে আঘাত পেলেন নরেশ। সব জায়গাটাই ছেড়ে দিলেন।

নরেশের মনে হ'লো, যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি নির্বাচনে শোচনীয়-ভাবে হারিয়েছেন, সে এখানেও এসেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। এখানে তাকে হারাবেন, এমন শক্তি কোথায় তাঁর?

আশ্চর্য, উমা শুকনো গলায় বিদায় জানালো তাঁকে। একবার অনুরোধ করল না, আর একটু বসে যান। মেয়েদের মনের রহস্য বোঝা ভার।

নরেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উমার মা লক্ষ্য ক'রে খুশী হলেন মনে মনে। বড় লোক মানুষ। বাড়ীতে ছুট করতেই এসে হাজির হয়। আসতে মানা করতে পারেন না। কিন্তু ওর আসাটা একেবারেই পছন্দ করেন না তিনি।

সুধীর মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। সে বুঝতে পেরেছে, বিরক্ত হ'য়েই চলে গেলেন নরেশ। কিন্তু তার প্রতি উমার এ সৌজন্যের কোন কারণ সে খুঁজে পেল না। বেশ একটু অবাক হ'য়েই সুধীর জিগ্যেস করলো—ওঁকে বসতে বললে না উমাদি?

—যাগ্‌গে। তোমার তাতে কী? বরং গেছে বলেই তোমার আরো সুবিধে হল। শত্রুপক্ষ সামনে বসে থাকলে কি বলতে পারতে খুলে দরকারের কথা? যাক্—কি বলতে এসেছ বল শুনি।

—যা বলতে এসেছিলুম, তা আর বলা হবে না।

—কেন?

—তুমি যে অসুস্থ।

—তা হোক। বল, শুনছি।

—কালকের মিটিংয়ের কথা বলতে এসেছিলাম। অসুস্থ হ'য়ে না পড়লে যেতে পারতে তুমি।

—ও, আমার যাবার অনুমতি পেয়েছ বুঝি?

—হ্যাঁ, পেয়েছি।

—আচ্ছা বেশ। আমি যাব। নিশ্চয়ই যাব। শরীর খারাপ থাকলেও যাব। তুমি দেখে নিয়ো।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুধীর মাথা চুলকিয়ে বলল—একটা প্রসঙ্গে একটা কথা তোমায় জিগ্যেস করব। ইচ্ছে হ'লে জবাব নাও দিতে পারো অবশ্য।

—কি কথা বল।

—তোমার ভেতর একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। আমি কিছুতেই কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না। এর কারণ কি আমায় বলবে উমাদি?

শুনে উমা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে পড়ে রইল চোখ বুজে। সহসা এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। সত্যিই তো, সুধীরদের দিকে তার এই মানসিক আকর্ষণের হেতু কী? এর জবাব কি তারই জানা আছে? না জানুক, এটা সে বেশ বুঝতে পারছে, মোহভঙ্গ হ'য়েছে তার। ঐশ্বর্য, বিলাস, সুখী নিশ্চিন্ত জীবন, এ সবের মোহ আর তার নেই। জীবনটাকে নতুন পবিবেশের মধ্যে ফেলে, মনটাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে দেখতে চায় তার মাধুর্য কতখানি। তার জন্যে সে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে, সমস্ত রকম দুঃখ বরণ করতে প্রস্তুত।

কী ভুলই না মনের ভেতরে এতদিন পুষে রেখেছিল সে। ভেবে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। নরেশ তাকে বালা দিয়েছেন এক জোড়া। বিনিময়ে সে দিয়েছে তার দেহ। এতদিন ভেবে এসেছে, কেউ ঋণী নয় কারো কাছে। এখন মনে হলো, কত ভুল সে ধারণা। সে বালাজোড়াটা ইচ্ছে করলে নরেশের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিতে পারে। কিন্তু নরেশ কি পারেন ফিরিয়ে দিতে তার কৌমার্য? পারেন না। তাহ'লে ঋণী কে? তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নরেশ কি তার সর্বস্ব লুণ্ঠণ করেন নি?

—উমাদি, চুপ করে রইলে যে?

—কারণ কী আমিই ঠিক জানি? একটু চুপ ক'রে থেকে উমা জিগ্যেস করল—সুধীর, একটা কাজ করতে পারো?

—বল।

—আমি যেন কোথায় কোন্ অন্ধকার অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছে থাকলেও আমার সামর্থ্য নেই উঠে আসি। তুমি আমাকে পার টেনে তুলতে ?

—তার মানে ?

—মানে তোমাকে খুলে বলতে পারব না। এ কথার মানে তোমাকেই খুঁজে বার করতে হবে। সে যাক্। আপাততঃ আমি তোমাদের কাজে লাগতে চাই।

—শুনে খুশী হলাম। তাই হবে উমাদি। তাই হবে। কিন্তু দেখো, আফশোষ কোরো না যেন পরে।

-তা করবো না, কিন্তু একথা বললে কেন ?

—এর জবাব সাদা-মাটা কথায় বলা শক্ত উমাদি। কোন জিনিস সহজে বোঝান না গেলে রূপকের আশ্রয় নিতে হয়। এ প্রসঙ্গে আমাকেও সেই পথ ধরতে হচ্ছে।

—যথা ?

—তাহ'লে শোনোঃ জীবন-নদীর এক পার থেকে অপর পারে আসতে চাইছ,—আগেই বলে নিই, এখানে নদীর হুই পার প্রচলিত অর্থে জীবন-মৃত্যু নয়, ঐশ্বর্য আর দারিদ্র্য—মনে ভাবছ হয়ত শান্তি পাবে। এসে হয়ত দেখবে এখানেও ভুল। হু'দিকেই জ্বালা। একদিকে ঐশ্বর্যের দম্ভে মনুষ্যত্ব হারাবার, অন্যদিকে দারিদ্র্যের। হুটোই হয়ত তোমার কাছে অসহ্য ঠেকবে। আচ্ছা উঠি উমাদি ?

উমা খপ ক'রে সুধীরের হাতটা ধরে ফেললো। বললো—ঐশ্বর্যের দম্ভে মনুষ্যত্ব কেমন ক'রে হারায় মানুষ, তা কি তুমি চোখে দেখেছ সুধীর? না কি শুধুই কথার কথা বললে? বল, চুপ ক'রে থেকোনা—

—এ শুধুই কথার কথা নয়, আমি সব জানি উমাদি, শুধু নরেশ কাকার কথা নয়। গ্রামের প্রতিটি লোকের নাড়ী নক্ষত্র আমি জানি। সে যাক, আমাকে যেতে দাও।

উমা সুধীরের হাতখানা ছেড়ে দিল না। নিজের কপালের ওপর চেপে ধরল সেখানা। বললো—আঃ, কি ঠাণ্ডা তোমার হাতখানা। মাথাটায় অসহ্য যন্ত্রণা হ'চ্ছে, দেখিতো, তোমার হাতখানার গুণ। যন্ত্রণাটা কমে কিনা।

—মাথাটা টিপে দিতে বলছ তো আসলে ?

—ঠিক তাই।

—দাঁড়াও। তোমার বোনদের কাউকে ডেকে দিচ্ছি। তোমার যন্ত্রণা না কমলে আমার হাতযশ কমবার ভয় আছে।

বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল সুধীর। দুপাশের রগ দুহাতে চেপে ধ'রে উমা যন্ত্রণাটা রোধ করবার চেষ্টা করল। সুধীরের এমনভাবে চলে যাওয়ার অর্থ বুঝতে বাকী রইল না তার। একটি মিষ্ট অনুভূতি ক্রমশঃ ছাপিয়ে উঠে তার মাথার যন্ত্রণাকে চাপা দিল।

পরদিন বিকেলে অসুস্থ শরীর নিয়েও বৈঠকে গেল উমা। প্রত্যেকের কথা সে শুনছিল মন দিয়ে। প্রত্যেকটি মানুষ একটি বলিষ্ঠ নীতিকে আঁকড়ে রয়েছে বলে তার মনে হ'ল। একটি মহৎ আদর্শ-চালিত কয়েকটি মানুষের মন যেন একই সূত্রে গাঁথা। তাদের বিশ্বাস শক্ত বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা থেকে কোন অবস্থাতেই তাদের টলানো সহজ নয়।

বৈঠকে সুবিখ্যাত নেতা সাধারণভাবে সাংগঠনিক ত্রুটি বিচ্যুতির কথা আলোচনা করে বিদায় নিলেন। তাঁকে অন্যত্র যেতে হবে। তাঁর সময়ের দাম আছে। একই দিনে দশ জায়গায় হয়ত বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হবে।

তিনি চলে যাবার পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল। শশাঙ্কশেখর উপস্থিত ছিলেন। তিনি একেবারে নীরব। নির্বাচনে পরাজয় বরণ ক'রে তিনি মনে মনে খুবই আঘাত পেয়েছেন। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না।

আলোচনা সকলের প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, এমন সময় সুধীর প্রস্তাব করলো—উমাদির কাছে এবার আমরা কিছু শুনতে চাই।

এতক্ষণ উমা মন দিয়ে সকলের কথা শুনছিল। এবার তাকে কিছু বলতে হবে শুনে যেন ঘামতে লাগল। কী বলবে সে? মুখ না তুলেও সে বুঝতে পারল, অনেক জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি তার ওপরে নিবদ্ধ। কিছু বলতে চেষ্টা করল উমা। গলাটা একবার ঝেড়ে নিলে। উমা বললো—আপনাদের গত নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ আমার স্পষ্ট জানা আছে।

এক পাশ থেকে একজন অসহিষ্ণু অল্পবয়সী ছোকরা বলে উঠল—জানবেনই তো। আপনি নিজেই তো তার একমাত্র কারণ।

প্রতিবাদ করল সুধীর। সভায় মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। সবাইকে শান্ত হ'তে অনুরোধ জানালেন শশাঙ্কশেখর।

উমা রুমালে মুখের ঘাম মুছে আবার বলতে সুরু করল—আপনাদের সমবেত শক্তিকে হারাতে আমার মত সামান্য একটি মাত্র মেয়েকে দায়ী করলে আমাকে অযথা বড় করা হবে। আপনাদের পরাজয়ের কারণ, আপনাদের অর্থাভাব। ভোটের দিনে একখানাও ট্যাক্সির ব্যবস্থা করেন নি আপনারা। লোকে পায়ে হেঁটে এসে আপনাদের ভোট দিয়ে যাবে, এমন ধারণা করাই অন্যায়। ওরা জেতবার জন্যে হাজার হাজার টাকা ঢেলেছিল। জয়লাভের পর কর্মিদের জন্যে যে ফিস্ট দেওয়া হল, তাতেই নরেশবাবু হাজার টাকা খরচ করেছেন। তার তুলনায় কি ক'রেছেন আপনারা?

সভায় সকলেই একেবারে চুপ। উমার কথা উড়িয়ে দেবার নয়। কিন্তু তা মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। একটু পরেই সভায় আবার গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। সকলের মুখই প্রতিবাদে মুখর হ'য়ে উঠল। ভোট টাকা দিয়ে [illegible] নির্বাচন বৈতরণী

পার হ'তে ঘৃণাবোধ করে তারা। জনসাধারণ যেদিন সচেতন হবেন, সেদিন তাঁরা পায়ে হেঁটে এসেই তাঁদের ভোট দিয়ে যাবেন।

উমা শান্তস্বরে বললো—ওরা টাকা দিয়ে ভোট কিনেছে বললেন, আচ্ছা সেকথা মানলাম। লোকের যথার্থ কাকে ভোট দেবার ইচ্ছে, এতে বোঝা গেল না সে কথাও ঠিক। কিন্তু জিগ্যেস করছি, আপনারাও কি ইলেক্‌সানে আন্‌ফেয়ার মিন্‌স নেননি ?

কয়েকজন প্রতিবাদ ক'রে বলল—কক্ষনো না—একটা প্রমাণ দিতে পারেন ?

উমা মৃদু হেসে বলল—পারি। শ্যামদার বউ কি একবার কুমারী, দ্বিতীয়বার সিঁথির সিঁদূর মুছে বিধবা সেজে ফল্‌স ভোট দেন নি ? শেষবার ধরা পড়ে গিয়ে যা তা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন নি ?

সভায় মহা হৈ চৈ বেধে গেল আবার।

শশাঙ্কশেখর হাল ছেড়ে দিলেন। সুধীর আর অরুণা সভার শান্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে আবার শান্ত হয়ে বসল। অরুণা চীৎকার ক'রে বলে যেতে লাগল—আমাদের মস্ত দোষ, সমালোচনা শুনলে আমরা রেগে যাই। উমাদির কথা খুবই সত্যি। আগামী নির্বাচনে ফাণ্ডের কথা যেন আমাদের মনে থাকে।

সভা শেষ হ'তে যে যার বাড়ী চলে গেল। অরুণা সুধীরকে বলল—উমাদির শরীর খারাপ। যাও ওঁকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এস।

সুধীর বললো—চলো উমাদি।

তর্কপঞ্চানন রোড ধরে হাঁটছিল দু'জনে। খোয়া-ওঠা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। মাঝে মাঝে জলকলের কাছটাতে এক হাঁটু কাদা। রাস্তায় জল জমে আছে। ড্রেনগুলো বুজে গেছে ময়লায়।

যে কোন রাস্তা ঘুরলেই পৌরসভার এই রকম চরম ঔদাসীন্য নজরে পড়বে।

চলতে চলতে সুধীর জিগ্যেস করল—খুব বিশ্রী লাগল তোমার, না?

হেসে উমা বললো—মোটেই না। আমার বেশ লাগছিল। ওরা নিজেদের দিক থেকে সকলেই খাঁটি। আমি আজই ওদের আপন হ'য়ে যাবো, এটা তো সম্ভব নয়। আমি চেষ্টা করব।

—যাক্‌, নিশ্চিন্ত হ'লাম। আমি ভাবলাম, তুমি বোধ হয় মনে মনে রাগ করেছ।

—রাগ করব কেন? যাক্‌—তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করি। তুমি দেশসেবা ক'রছ, রাজনীতি ক'রছ, বেশ ক'রছ। কিন্তু নিজের জন্যে কী ক'রছ শুনি?

—'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী 'পরে।'

—আসেনি? হেসে বলল উমা —আসেনি হয়ত তোমার মতই এক-আধজন। নিজের যৎসামান্য প্রয়োজন যদি নিজে না মেটাতে পারো, তাহ'লে তুমি যে লোকের আস্থা হারাবে সুধীর।

—তার মানে?

—তোমার এই একমুখ দাড়ি, এক মাথা রুক্ষ চুল, খালি পা, বাড়ীতে গঞ্জনা সহ্য ক'রে দু'মুঠো প্রত্যহ ভাত গেলা,—এ সবই তোমার দৈন্যের দিক। লোকে এটা পছন্দ করে না।

—তাহ'লে?

—নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করো। উপার্জন করো। লোকের কাছে প্রমাণ করো, তোমার সাধ্য আছে, ভালভাবে খেয়ে পরে বাঁচবার ক্ষমতা আছে। নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত না করলে তো তুমি কোনদিনই কারো কাছে দাঁড়াতে পারবে না সুধীর।

—উমাদি?

—আঃ 'উমাদি উমাদি' শুনলে রাগ ধরে আমার। সুধীর, তুমি আমাকে দিদি ব'লে ডেকোনা।

—তাহলে কী ব'লে ডাকবো ?

—নাম ধরে ডাকবে।

সুধীর চুপচাপ পথ চলতে লাগল। তর্কপঞ্চানন রোড্ শেষ ক'রে ব্যানার্জীপাড়া রোড্ দিয়ে চলছে তারা। এ রাস্তাটা পীচের। মাঝে মাঝে কোন কোন বাড়ীতে জল কল নেওয়ার জন্যে রাস্তা খোঁড়া হ'য়েছে। তারপর আর মেরামত হয়নি। খালি পায়ে চলতে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে সুধীর। তবু কষ্ট হচ্ছিল তার।

উমা লক্ষ্য ক'রে বললো—একজোড়া চটির কত দাম ?

—কেন বলত ?

—জিগ্যেস করছি।

—কত আর ? পাঁচ ছ' টাকা হবে।

—আমি দোব টাকাটা, তুমি একজোড়া চটি কিনে নিও।

—না, না, তুমি কোত্থেকে দেবে ?

—জানো সুধীর, আমি মাস গেলে আশী টাকার মত রোজগার করি টিউসিনি ক'রে।

—তাহোক, তোমার কাছ থেকে আমি টাকা নিতে যাবো কোন্ দুঃখে ?

—কেন, পৌরুষে বাধবে ?

—নিশ্চয়ই।

—শুনে সুখী হ'লাম। তাহ'লে কথা দাও, নিজের দিকে এবার থেকে তাকাবে। এখানে তোমার কত বন্ধু-বান্ধব, চেনা-জানা, কোনো জায়গায় যে কোন মাইনেতে ঢুকে পড়ো।

—তাহ'লেই হয়েছে। যারা আমাকে চেনে, তারা কখনই এ আপদকে ঢোকাবে না। ভাববে, কাজে ঢুকেই শ্রমিকদের ক্ষেপাতে শুরু করবে।

উমাদের বাড়ীর কাছাকাছি ওরা এসে গিয়েছিল। সুধীর বললো—এবার তাহ'লে আমি যাই?

উমা দাঁড়িয়ে পড়লো। সুধীরের মুখের পানে তাকিয়ে মৃদু হেসে সে জিগ্যেস করলো—যা বললাম, মনে থাকবে?

—কেন বল দেখি? তুমি কি আমাকে নিয়ে সংসার পাততে চাও নাকি?

হাসতে হাসতে উমা বললো—ঠিক ধরেছ। আচ্ছা, এসো তুমি।

সাপের মত বেণীটা দুলিয়ে উমা বাড়ীর ভেতর গিয়ে ঢুকলো। একবার পেছন ফিরে চাইল সে। সুধীর ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

॥ এগারো ॥

গ্রামের ভিতর ধনে-মানে রামেশ্বর বাঁড়ুয্যের জুড়ি নেই। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তি করেছেন। কলকাতায় জুয়েলারী দোকান। গ্রামে অনেকগুলো বাড়ী। জমি জায়গাও অনেক। ছেলে-পুলে, নাতি-নাতনীতে মিলে জমাজমাট সংসার।

বড়ছেলে নরেশকুমার। কৃতি ব্যবসায়ী তিনি। নয়নপুর পৌরসভায় পর পর দু'বার কমিশনার দাঁড়িয়েছেন। শ্যামনগরেই তাঁর কাঠের কারখানা। কলকাতার দোকান দেখেন মেজছেলে। অত্যন্ত প্রিয়দর্শন আর মিষ্টভাষী। চরিত্রবান এবং কর্মঠ তিনি। রামেশ্বরের ছোটছেলে হাই-কোর্টের এ্যাড্ভোকেট।

রামেশ্বর খুবই বৃদ্ধ হয়েছেন। সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগের পর শরীর আর মন আরো ভেঙ্গে গেছে। একটি বেতের লাঠি হাতে বিকেলের দিকে এধার-ওধার একটু ঘুরে বেড়ান রামেশ্বর। গেটের ধারে বসে থাকেন ওভারব্রিজে ওঠবার সিঁড়ির নীচের ধাপে। আরো জনকয়েক বৃদ্ধ এসে জোটেন,—ছেলের রোজগারে, নিজের সঞ্চয়ে কিংবা মাসে মাসে পেন্সনের টাকায় যাদের দুশ্চিন্তাহীন জীবন অতিবাহিত হ'চ্ছে। জীবন সায়াহ্নে এসে যাঁরা তাকিয়ে আছেন পরপারের দিকে।

গল্প করতে করতে রামেশ্বর লক্ষ্য করেন, ডাউন লাইনে দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে বহুক্ষণ ধরে কথা কইছে। তাঁর মনে হ'লো, কাজটা ওরা ঠিক ক'রছে না। অল্প সময় নয়। কেন এতক্ষণ ধ'রে কথা ক'য়ে চলেছে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে। লাইনের বাইরে এসে কথা কইতে কী হয়। যদি হঠাৎ পেছন থেকে একটা ট্রেন ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহ'লে—

না, ওদের ডেকে সাবধান করে না দিলে মনের ভেতর স্বস্তি পাচ্ছেন না। ছেলেদুটিকে তিনি চেনেন। বয়স ওদের কম নয়। বেশ বুদ্ধিমান ছেলে ব'লে ওদের জানেন রামেশ্বর। গ্রামে পাঁচটা কাজে-কর্মে ওদের বেশ সুনাম আছে। তাহ'লে এমন নির্বোধের মত কাজ ক'রছে কেন ওরা ?

রামেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন। গেটের কাছে এসে ওদের মধ্যে একজনকে ডাকলেন—বাবা শঙ্কর। একটা কথা বলছিলাম।

দুজনেই ওঁর কাছে এগিয়ে এল।

—কিছু মনে করোনা তোমরা, আমাদের বয়স হ'য়েছে, দেখে ভাল লাগল না তাই বলছি।

—কিছু বলবেন ?

—হ্যাঁ, বলব বৈকি। বলব ব'লেই ত তোমাদের ডাকলাম।

—বলুন।

—এই যে তোমরা লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে দুজনে গল্প করছিলে, আমি আধঘণ্টা ধরে লক্ষ্য করছি। এটা কি ভাল বাবা ? ধরো একটা গাড়ীই যদি এসে পড়ত ঝপ করে ?

—না তো, সেদিকে আমাদের নজর ছিল বৈকি !

—তাহ'ক বাবা, গল্প ক'রতে ক'রতে কখন বেহুঁস হয়ে যাবে, বিপদ হ'তে কতক্ষণ।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। সত্যি, এটা আমাদের অন্যায় হ'য়ে গেছে। মনে থাকবে আপনার কথা।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে দেখে বৃদ্ধেরা যে যাঁর ঘরমুখো হলেন। লাঠিতে ভর দিয়ে রামেশ্বর হাঁটছিলেন ধীরে ধীরে। মোটা গোলগাল চেহারা। ইদানীং গায়ের চামড়া লোল হয়ে গেছে। গলার চামড়াটা ঝুলে গেছে অনেকখানি। হাত মুখও সামান্য সামান্য ফুলতে আরম্ভ করেছে।

যেতে যেতে ছেলে দুটির কথা মনে পড়ল তাঁর। নিজেও তো ওদেরই মত বেহুঁস হ'য়ে রয়েছেন। মরণের দিকে পিছন

ফিরে। এখনো সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটরা ক'রে দেননি। সময় থাকতে থাকতে ক'রে দেওয়া ভাল। কখন মৃত্যু এসে থাবা বাড়াবে, টের পাবেন না। না, ছেলেদের কালই ডাকবেন। যে যার সম্পত্তির অংশ বুঝে সুঝে নিক।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে দেখেন, বৈঠকখানায় বেশ ভীড়। নরেশের বন্ধু-বান্ধবেরা এসেছে বোধ হয়। মনে মনে রামেশ্বর স্থির করলেন, নরেশকে এই দিকের অংশটাই দেবেন। বাইরের লোকের ঝামেলা নিয়ে দিনরাত ওকে থাকতে হয়। এদিকটার সঙ্গে অন্দর মহলের যোগাযোগ নেই। দোতলার ওপরে এ বিল্ডিং থেকে ও বিল্ডিংয়ে একটা সংযোজন মাত্র। এতে সুবিধেই হবে নরেশের।

মেজছেলেকে বাড়ীর ভেতরের অংশটা দেবেন। ইষ্ট ঘোষ-পাড়া রোডের দুধারে অনেকগুলো ঘর ভাড়া দেওয়া আছে। সেগুলো ওদের দু'ভাইকে সমান ভাগ করে দেবেন। কলকাতার জুয়েলারী দোকানটাও দুভাগ ক'রে দু'ছেলেকে দেবেন। নরেশ আর রমেশকে।

বাকী রইল ছোট ছেলে বীরেশ। তার কথা ভাবতেই মুখখানা কুঁচকে গেল রামেশ্বরের। তার নামও মুখে উচ্চারণ করেন না তিনি। বাড়ীর সবাই যেন ইচ্ছে করেই ভুলে গেছে তার কথা। বীরেশকে কি দিয়ে যাবেন রামেশ্বর? না, একটি কপর্দকও দেবেন না তাকে। শ্যামনগরে আসবার মত তার মুখ নেই। নিজের মুখও সে পুড়িয়েছে। বাড়ীশুদ্ধ সবার মাথা হেঁট করেছে সে। তাকে আবার কি দেবেন?

কিছুই দেবেন না বীরেশকে। কিন্তু কেন? সে অনেক কথা। ভালো কথা নয়। মনে পড়ে গেলে বড় কষ্ট পান রামেশ্বর। তাঁর ছেলে হ'য়ে বীরেশ কিনা এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার ক'রে বসলো! ছি ছি।

অথচ তাঁর ছোটছেলেটিই বিত্তায় বুদ্ধিতে ভায়েদের মধ্যে সেরা। কথাবার্তা, চালচলনে যেমন ক্ষুরধার বুদ্ধি আর মার্জিত রুচি প্রকাশ পেত, তেমনি ছিলেন তিনি বিনয়ী। এই গুণটি বীরেশ পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে। ধনীশ্রেষ্ঠ রামেশ্বরের ব্যবহার ছিল খুবই অমায়িক। তাঁর নামে শ্রদ্ধায় নুইয়ে পড়ে সকলের মাথা।

বীরেশ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে তিনি আইন পড়তে লাগলেন। বরাবর কলকাতা থেকেই পড়াশুনো করেছেন তিনি। ছুটি-ছাটায় বাড়ীতে আসতেন। দুর্গাপূজো উপলক্ষ্যে অভিনয় হ'তো। তাতে তিনি চমৎকার অভিনয় করতেন।

আইন পাশ করে বীরেশ হাইকোর্টে প্রাকটিশ স্থুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কৃতি এ্যাড্‌ভোকেট হিসেবে তাঁর স্থনাম ছড়িয়ে পড়ল। অঢেল পয়সা রোজগাব করতে লাগলেন তিনি। কলকাতায় মস্ত বড় বাড়ী ক'রে সাহেবী কায়দায় বাস করতে লাগলেন।

রামেশ্বর বিয়ের জন্যে পেড়াপীড়ি করেছিলেন বীরেশকে। তিনি রাজী হননি। কত বড় বড় জায়গা থেকে তাঁর সম্বন্ধ এসেছে। স্থন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী। আত্মীয়-স্বজনরা কত পেড়াপীড়ি করেছেন তাঁকে বিয়ে করার জন্যে। কেউ রাজী করাতে পারেননি।

বীরেশ শ্যামনগরেও আসা-যাওয়া বন্ধ করেছেন। তাঁর মনে হ'ত, গ্রামের পরিবেশে তাঁকে মানাবে না। কি আছে সেখানে? জঙ্গল, নোংরা আবর্জনা আর বিশ্রী পথঘাট। আর যত সব অশিক্ষিত, আন্‌কালচারড্‌ মানুষ। না আছে সোসাইটি, না আছে বার-অ্যাসোসিয়েসন, না কোন শিক্ষিত মার্জিত রুচির মানুষ।

কলকাতা ছেড়ে গ্রামে তাই আর যান না বীরেশ। মাঝে মাঝে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। নিজের মোটর নিয়ে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে।

আলিপুর জাজেস্ কোর্ট রোডে বিরাট অট্টালিকায় বাস করেন বীরেশ। মালীর তত্ত্বাবধানে পরিপাটী ক'রে সাজানো বাগান। গেটের ভেতরে কাঁকর বিছানো পথ। দুপাশে রকমারী ফুল ফুটে জায়গাটা আলো ক'রে রেখেছে। অট্টালিকার সামনে যেখানে মোটর এসে দাঁড়ায় তার ডান দিকে রাধামাধবীর লতা উঠে গেছে ওপরে। থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে তাতে। ঝক ঝক তক তক করছে চারদিক। গাছ থেকে একটি শুকনো পাতা ঝরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মালী এসে কুড়িয়ে ফেলে। ঘর-দোর, বাগান-বাগিচা ঝি-চাকরদের সযত্ন তত্ত্বাবধানে দিনরাত ঝক ঝক করে আয়নার মতো।

বীরেশ বিয়ে করেননি। কিন্তু জীবনকে কোনওদিক থেকে বঞ্চিত রাখেননি তিনি। বল্‌গাহীন অশ্বের মতই জীবনটা নিয়ে দাপাদাপি ক'রে বেড়াতেই তাঁর আনন্দ। বাঁধনে তাঁর আকর্ষণ নেই। বাঁধনে ধরা দিতে চাননা তিনি।

বাঁধন-হারা উদ্দাম জীবন স্রোতে ভাঁটা পড়ে এল বীরেশের। জীবনের বসন্ত ঋতু বিদায় নিল। দেহে, মনে নেমে এল শীতের জড়তা। সে রক্তের তেজ আর নেই। মাথায় টাক পড়েছে বীরেশের। বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হ'য়ে গেছে।

নিরুপদ্রবেই দিন কাটছিল বীরেশের। এমন সময়ে ঘটল ছন্দপতন। সেদিনের কথা। হাইকোর্ট থেকে সোজা বাড়ী ফিরলেন বীরেশ। গাড়ী থেকে নেমে ড্রয়িংরুমে ঢুকেই অবাক হ'য়ে গেলেন তিনি।

একটি চেয়ারে জড়োসড়ো হ'য়ে বসে এক মহিলা। বয়স বেশী নয়। চেহারা দেখে ভদ্র ঘরের বলেই মনে হয়। দেখতে সুশ্রী। পরণে সাদাসিধে পোষাক। ওই পোষাকেই আঁট সাঁট শরীরটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বীরেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন মহিলাকে। ভাবলেন, কোনও দুঃস্থা মহিলা হয়ত সাহায্য চাইতে এসেছে। এমন তো কতই আসে।

বীরেশ ঢুকতেই মহিলাটি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বীরেশ কোনও প্রশ্ন না করেই একটা পাঁচটাকার নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

মাথা নত ক'রে মহিলাটি খুব নীচু গলায় বললো—আমি ভিক্ষে করতে আসিনি।

বেশ একটু অবাক হ'য়ে বীরেশ তাকালেন তার দিকে। নোটটা পকেটে পুরতে পুরতে বললেন—ও, তাহ'লে কি দরকার শুনি?

—বলছি। কিন্তু আপনি এই মাত্র ফিরলেন। ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে। আপনি পোষাক বদলে আগে খানিকটা জিরিয়ে নিন। আমি বসছি ততক্ষণ।

—খুব ভাল কথা। আচ্ছা, আমি আসছি এক্ষুণি।

আধঘণ্টা পরে বীরেশ ফিরে এলেন। মহিলা আবার দাঁড়িয়ে উঠলো। বীরেশ বললেন—দাঁড়াতে হবে না, বসুন।

—আমাকে 'আপনি' বলবেন না।

—আচ্ছা তাই হবে। বল এখন কী বলবে!

—আমি দুঃস্থ মেয়েছেলে। আমি আশ্রয় চাই।

—সেকি? না না, তুমি অন্য কোথাও যাও, আমি বরং—

—না, পাঁচটাকা সাহায্য দিয়ে বিদেয় করবেন না। কাজ চাই আমি। রান্নাবান্নার কাজ।

—আমার বাবুর্চি, খানসামার অভাব নেই।

—তা জানি, আমি তাদের চেয়েও ভাল রাঁধতে জানি।

—বটে? আচ্ছা সে দেখা যাবে। পরে এসো।

—কিন্তু কোথায় যাবো আমি?

—সে কি! কোথায় যাবে তা আমি কি ক'রে জানব? কোথায় ছিলে এতদিন? সেখানেই যাবে।

—ছিলাম এখান থেকে অনেক দূরে। বলতে গেলে এক বস্ত্রেই চলে এসেছি। আর এসেছি আপনার ভরসাতেই।

—আমার ভরসাতেই? হেঁয়ালি রাখ। কি করতে এর আগে?

—এক বাবুর বাড়ীতে রান্নাবান্নার কাজ করছিলাম। অদৃষ্টে সইল না।

—কেন?

—সে অনেক কথা। শুনলে হয়ত আমাকেই দোষী করবেন।

—থাক, তা'হলে বোলো না।

—কিন্তু না বললেই বা আপনি সব কথা জানবেন কেমন ক'রে? আমি যে আপনারই পায়ে আশ্রয় নিতে এসেছি।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার কথাবার্তা যেন কেমন কেমন লাগছে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে জান। কিন্তু আমি তো—

—আপনাকে আমিও এর আগে দেখিনি। তবে আপনার কথা অনেক শুনেছি। না দেখলেও আপনাকে তাই চিনতে কষ্ট হয়নি।

—কোথায় শুনেছ আমার কথা?

—তা বলতে পারবো না? সে শুনে কাজ নেই।

—এ তো বেশ ফ্যাসাদ দেখতে পাচ্ছি। তুমি কিছুই বলবে না। আর আমি কিছু না জেনে শুনে তোমাকে ঘরে রাখি কেমন ক'রে?

—একজন আশ্রয়হীনাকে নাড়ীনক্ষত্র সব না জেনে আশ্রয় দিতে ভরসা হয় না আপনার? এত ভয় কিসের? ঘরে তো স্ত্রী নেই!

বীরেশ মুখ তুলে মহিলার দিকে তাকালেন। মহিলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁরই পানে। নিষ্পাপ, ডাগর চোখ দুটিতে মিনতি মাখান। মাথার ঘোমটা কখন খসে গেছে মহিলার। মাথায় রুক্ষ একরাশ চুল পেছনে এলোখোঁপায় সংহত। চূর্ণ দু'-একটি কুন্তল ছোট্ট কপালের ওপর উড়ে উড়ে পড়ছে।

মহিলা সঙ্কোচ দূর ক'রে বললো—একান্তই যখন না শুনে বাড়ীতে ঠাঁই দেবেন না, তখন সব কথা বলতেই হবে আমাকে।

—শোনবার পরও যে ঠাঁই দোব, কি ক'রে জানলে?

—আমি যে আপনার ভরসাতেই এসেছি।

—আচ্ছা বল শুনি।

—শুনুন। যাঁর বাড়ীতে রান্নাবান্না করতাম, সেই মনিবের জন্যেই আমাকে পালিয়ে আসতে হ'য়েছে।

—কেন?

—বাবুটির স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। পরিবার, ছেলেমেয়ে নিয়ে ভরা সংসার। তবু আমার দিকে কুনজর দিতেন। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম তাঁর জ্বালায়।

—তারপর?

—একদিন তিনি মুখ খুললেন আমার কাছে। বললাম—আপনার কথা রাখতে পারি, কিন্তু এক শর্তে। মনিব জিগ্যেস করলেন—কি শর্ত বল। তুমি যা চাইবে তাই দোব। বললাম—আমার শর্ত এই যে আপনার স্ত্রীর মতই সম্মানের সঙ্গে আপনার ঘরে এক খাটে আমাকে পাকাপাকি জায়গা দিতে হবে।

—তারপর?

—শুনে ক্ষেপে গেলেন ভদ্রলোক। তাড়িয়ে দিলেন বাড়ী থেকে। এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছি সেখান থেকে। বাড়ীর বাইরে পা দিয়েই মনে পড়ে গেল আপনার কথা। আপনার ঠিকানা আমার জানা ছিল।

—তোমার মনিবটি কে বল তো?

—আপনি না হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট? এটুকুও বুঝতে পারলেন না? আমার সেই মনিবটি হ'লেন, আপনার বড়দা, নরেশবাবু।

—অ্যাঁ!

—বিশ্বাস হচ্ছে না, দাদা?

—না, না, এতক্ষণে সব কথা বুঝতে পারছি তোমার। এমন স্পষ্ট কথা বলার সাহস যে সে মেয়ের থাকে না। কিন্তু আমার এখানেও তো তোমার জায়গা হ'তে পারে না।

—হ'তে পারে না? কিন্তু কেন বলুন তো? বাবুর্চি, খানসামার খরচ আমি নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে দেবো।

বীরেশ বললেন—সেজন্যে নয়। আমিও তো সেই দাদারই ভাই?

সহাস্যে মহিলা বললো—আমি মানুষ চিনি।

এসব অনেক দিনের কথা। গ্রামের লোকের কানে কিছু কিছু এসেছে এসব। অনেক সত্যি মিথ্যের রং চড়িয়ে। এ নিয়ে কোন মন্তব্য করতে কারো সাহস হয় না।

বীরেশ গ্রামে কোনদিনই আসেন না। তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহলও তাই দপ ক'রে জ্বলে নিভে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। সেই মহিলাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বীরেশ। কবে একদিন তাকেই জীবনের সঙ্গিনীর মর্যাদা দিয়েছেন। সুখী হ'য়েছেন তাকে নিয়ে। তার গর্ভে সন্তান-সন্ততি হয়েছে বীরেশের। একদিন বাবা-মার ইচ্ছের মূল্য দেননি বীরেশ। কত শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী দেখেছিলেন রামেশ্বর ছেলের জন্য। সেই বীরেশই প্রৌঢ় বয়সে বাঁধা পড়লেন, শিক্ষিতা নয়, উগ্র আধুনিকা নয়, অপরূপা রূপসীও নয়, সাদামাটা এক নারীর প্রেমে।

এমন তো কতই হচ্ছে, কে তার হিসেব রাখে। গ্রামের লোকে ভুলেই গেছে সে সব কথা। দিন বদলে গেছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশ-বিভাগ আর শত শত উদ্বাস্তুর আগমনে যেন রাতারাতি বদলে গেছে গ্রামের চেহারা। শ্যামনগর আর সে শ্যামনগর নেই। বর্ষার ভরা নদীর মতো ফুলে ফেঁপে উঠেছে গ্রামখানা।

ক্রমে দেশ-বিভাগের ধাক্কা সামলে উঠেছে উদ্বাস্তুরা। থিতু হয়ে বসেছে কলকাতার আশেপাশের শহরতলীতে। শ্যামনগরের

চারিদিকে যেমন কলোনীর পর কলোনী বেড়ে উঠেছে, তেমনি গড়ে উঠেছে হুগলী নদীর ধারে কাছে অনেক মিল, কল-কারখানা। শ্যামনগরের ওপর অতিরিক্ত যে জনসংখ্যার চাপ পড়েছিল, তারা রুজি-রোজগারের পথ খুঁজে নিল কারখানাগুলোতে। নতুন পুরনোয় মিশিয়ে। কিছু লোক ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করল। ইষ্ট ঘোষপাড়া রোড উঠল জাঁকিয়ে। সারি সারি দোকান বসল। হরেক রকমের। পুরাতন যে মূল্যবোধটুকু ছিল এখানের আদিম বাসিন্দেদের, যেমন বড়বাড়ী কিংবা মিত্তির বাড়ীতে, নতুনের জোয়ার কোথায় তা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শিল্প-প্রধান এ অঞ্চলের বাসিন্দেরা ক্রমশঃ হয়ে উঠল যন্ত্রের সমগোত্র। মানসিক অবক্ষয় দেখা দিল ধীরে ধীরে। সহজ মেলামেশা রইল না মানুষে মানুষে। সন্দেহ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা অধিকার করে বসল এখানের মানুষের মন। প্রতিষ্ঠানগুলোও এখানের পদস্থ ব্যক্তিদের দলাদলির ক্ষেত্র হয়ে উঠল। হাজার হাজার টাকার সরকারী সাহায্য আত্মসাৎ করে চলল তারা। এখানের শিক্ষা, সংস্কৃতি হ'ল বিপর্যস্ত, বিকারগ্রস্ত। রাজনীতি গ্রামের স্বচ্ছ আকাশখানাকে মেঘে ঢেকে দিলে। রাজনৈতিক বিদ্বেষ গোটা অঞ্চলটার আবহাওয়াটাকে দিলে বিষাক্ত ক'রে।

যাক, এসব কথা। রামেশ্বর এতদিন ঠিক করে রেখেছিলেন, কিছুই দেবেন না বীরেশকে। তাঁর ছেলে বলে পরিচয় দেবার মত কাজ করেননি বীরেশ। শ্যামনগরে আসবার মত মুখ নেই তার।

গেট থেকে এতখানি হেঁটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন রামেশ্বর। বাড়ীর সামনে যে পুকুরটা বোজানো হচ্ছে তারই ঘাটে আগে ছিল বাঁধানো বেদী। এখনো আছে সেটা। তার ওপর বসে হাঁপাচ্ছিলেন রামেশ্বর। বীরেশের কথা ভাবছিলেন মনে মনে।

বিকেল থেকেই মনটা কেমন যেন বদলে গেছে রামেশ্বরের। হঠাৎ সেই কথাটা মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। মৃত্যু থাবা উঁচিয়ে বসে আছে। যে কোন মুহূর্তে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

ধীরে ধীরে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন রামেশ্বর। ভৃত্য পা ধুইয়ে, মুছে তাঁকে ঘরে বসিয়ে দিল। ফ্যানটা খুলে দিল জোরে। আরামে চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন আবার। কালই নরেশ আর রমেশকে ডেকে পাঠাবেন। বিষয়ের ভাগ-বাঁটরা তিনি থাকতে থাকতেই হয়ে যাওয়া ভাল। আবার সেকথা মনে পড়ল। পেছন থেকে মৃত্যু থাবা বাড়িয়ে কখন ঝাঁপিয়ে পড়ে কে জানে। রেল লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল ছেলে দুটি। সেই রকম নিশ্চিন্ত রয়েছেন তিনিও। আর ভুল নয়।

হঠাৎ চমকে উঠলেন রামেশ্বর। বাড়ীতে কিসের একটা আনন্দ কলরব শোনা গেল। কোন সুখবর এসে থাকবে হয়ত। তাতে চমকাবার কথা নয়। রামেশ্বর চমকে উঠলেন অন্য কারণে। বীরেশকে কিছুই দেবেন না কেন? সে অন্যায় করেছে ব'লে? ন্যায়-অন্যায় বোধ কি চিরকাল সমান থাকে? কি তার অন্যায়। মন্ত্র পড়ে সাত পাক ঘুরে বড় ঘরের শিক্ষিতা সুন্দরী বউ নিয়ে, বাপ মার ইচ্ছেমত সংসার পাতেনি, এই তার দোষ? একজন অজ্ঞাত কুলশীলাকে নিয়ে ঘর করছে, এই অপরাধে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন তাকে? কিন্তু বীরেশের জীবন তো মন্ত্র ছাড়াই, শিক্ষিতা, সুন্দরী বধূ ছাড়াই সার্থক হয়েছে তাকে নিয়ে। সার্থকতাই আসল কথা। জীবনটাকে ভালোভাবে উপভোগ করাই বড় কথা। এর মধ্যে অন্যায় কী আছে?

পুরাতন সংস্কার মন থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিলেন রামেশ্বর। মনের বোঝা যেন অনেকখানি হালকা হয়ে গেল তাঁর। রামেশ্বর স্থির করলেন, বীরেশকে নগদ টাকাকড়ি দিয়ে যাবেন। কাউকে বঞ্চিত করবেন না তিনি। বীরেশ যদি সে টাকা নিতে রাজী না হয় তো সেকথা আলাদা। তাহলে তিনি টাকাটা কোনও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করে যাবেন।

চোখ বুজে পাখার হাওয়া খেতে খেতে ভাবনায় ডুবেছিলেন রামেশ্বর। এমন সময় সুতপা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে এসে হাজির।

একেবারে রামেশ্বরের গলা জড়িয়ে ধরে বললো—দাদু, সুখবর শুনেছ ?

—কি খবর ভাই, তোমার বিয়ের লগ্ন কি সমাগত ?

—দূর, বলতে পারলে না ত ?

—পরীক্ষায় পাশের খবর পেয়েছ ?

—উঁহু, তার অনেক দেরী।

—তবে কি সেতার বাজিয়ে জলসায় মেডেল পেয়েছ ?

—তাও নয়। সেতার বাজানো ছেড়েই দিয়েছি।

—কেন, কেন ?

—দিদিমনি শেখানো ছেড়ে দিয়েছে। মিউজিক স্কুলও উঠে গেছে।

—বটে ? তাহলে বড় মুস্কিল তো নাতনী!

—সে যাকগে, কি সুখবর বলতে পারলে না ত ?

—এতগুলো বললাম, কোনটাই তো সঠিক হল না। সুখবরটা কী বলেই ফেল না ভাই!

—দাদা আসছে সপ্তাহে বিলেত থেকে আসছে।

—কি বললে, সুনির্মল আসছে ? সত্যিই তো সুখবর। দাদু স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ হয়ে আসছে। এবার তার নিজস্ব একটি রোগিণীর ব্যবস্থা করা দরকার। গবেষণার সুবিধে হবে। নরেশকে বলতে হবে কথাটা।

—দাদু, তুমি সব কথা ভুলে যাও আজকাল। দাদার রুগী তো ঠিক হয়েই আছে।

—কে ভাই ? ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বুড়ো হয়েছি ছাই, মনেও থাকে না। সেই সুব্রতার সহপাঠিনী তো ? সুব্রতার বিয়েতে এসেছিল ? যার রূপে অন্ধকার ঘর আলোয় ভরে যায় ?

—হ্যাঁ, গো হ্যাঁ—সেই।

—তবে আর চিন্তা কি! শাঁখ বাজাও নাতনী, শাঁখ বাজাও। সুব্রতার বিয়ের পর বাড়ীটা বড্ড ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। তার সহপাঠিনী এসেই সে ফাঁক পূর্ণ করুক।

॥ বারো ॥

উমা স্থায্য কথাই বলেছে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এতদিনে সুধীরের মনে হ'ল, বাবার দুর্ব্যবহারের মধ্যে এই সত্যই প্রকাশ পেয়েছে। মা মনে মনে এই কামনাই করেছেন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও। নিজের পায়ের নীচে আগে মাটী তৈরী করো। দাঁড়াতে চেষ্টা করো শক্ত জমির ওপর।

রোজকার করতে হবে। সংসারের কাছে সে অত্যন্ত মুল্যহীন একটা জন্তু ছাড়া আপাততঃ কিছু নয়। সংসারের কোন কাজেই সে লাগে না। অন্যায়ভাবে সে সংসার থেকে দিনান্তে দু'মুঠো কেড়ে খাচ্ছে। এ ভাবে চলবে না আর। সংসারে সাহায্য করতে হবে। নিজের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে হবে। মায়ের মুখে ফোটাবে হাসি।

কিন্তু কোথায় চাকরী? অন্যের কথা দূরে থাক, সুধীর যখন অনন্যোপায় হয়ে বাবাকেই ধরে বসলো—তোমাদের মিলেই আমার একটা চাকরী ক'রে দাও বাবা।

তখন, নীরেন মুখখানা তেঁতোপানা ক'রে বললেন—আমার সামনে নয়, অন্য কোথাও চষ্টা ক'রে দেখ। শেষকালে কুলি-কাবারীদের গিয়ে খেপাও আর কি। আর বুড়ো বয়সে সকলের কথা শুনি তোমার জন্যে না? মালিকরা জানতে পেরে পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে বলবে, পথ দেখ। তখন?

যেন সে দাগী আসামী। লোকের সেবা করা বামপন্থী রাজনৈতিক দলের এক চিহ্নিত ব্যক্তি। যাকে কাজ দিলে খাল কেটে কুমীর আনার সামিল হবে।

স্থানীয় এ. বি. সি. কারখানার প্রতিষ্ঠা বেশীদিন নয়। মিল এমন কিছু বড় নয়। শ্রমিক সংখ্যাও অল্প। কিন্তু তার ইউনিয়ন

দুটি। দুটি ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ লেগেই ছিল। কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত ইউনিয়নের পাণ্ডারা নিত্য নূতন দাবী তুলে বিপর্যস্ত ক'রে তুললো মালিক পক্ষকে। এদের সঙ্গে মালিকের পক্ষপুষ্ট অপর ইউনিয়নের কর্মীদের নেতৃত্বের লড়াইয়ে ঘায়েল হ'ল শ্রমিকরা। কয়েকজনকে ছাঁটাই করা হ'ল। অশান্তি লেগেই রইল দিনের পর দিন। ধর্মঘট হ'তে থাকল।

কখনো বা কোম্পানী 'লক আউট' ঘোষণা করে অনির্দিষ্টকালের জন্যে। শ্রমিকদের দুর্গতির সীমা রইল না।

কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত ইউনিয়নেরই শক্তি বেশী। তাদের দাবীর পেছনে যুক্তি ছিল। কিন্তু শ্রমিকদের যুক্তি মেনে চলতে গেলে ব্যবসা করা যায় না। দেখা গেল, গুণ্ডাদের ডাণ্ডায় মাথা ফেটেছে কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত ইউনিয়নের সেক্রেটারীর। সময় মত সাহায্য না পেলে জানও চলে যেত তার।

এই আন্দোলনের পেছনে সক্রিয় অংশ ছিল সুধীরের। তাকে চাকরী দিতে তাই কেউ সাহস করে না।

এমনি দিনেই সুধীরের মাথায় দুর্যোগের আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

নীরেন সুধীরের অনেক বেয়াদপিই সহ্য করেছেন। কতবার দূর দূর করে তাড়িয়েছেন বাড়ী থেকে। সে কেবল রাগের মুখে। তারপর আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন।

কিন্তু যেদিন উমার সঙ্গে সুধীরের মাখামাখির কথা তাঁর কানে গেল, সেদিন তিনি সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলেন। সুধীর সেদিন দুপুর রোদে ঝলসানো মুর্তি নিয়ে বাড়ী ঢুকতেই পা থেকে চটি খুলে নীরেন ঘা কতক বসিয়ে দিলেন তার পিঠে। তারপর ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে বললেন—যাও, দূর হও, আর বাড়ীমুখো হও না।

বিন্দুবালা কেঁদে ফেললেন। নীরেনের বিধবা ভগ্নি এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। আঁচলে চোখ মুছে বললেন—দুপুর

বেলায় না খাওয়া, না দাওয়া, ছেলেটাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলে দাদা?

—দেবনা? কত গুণের ছেলে! রোজগার নেই, পত্তর নেই, এদিকে ফাজলামী করার বেলায় ষোল আনা।

—শত্তুরেও সুধীরের নিন্দে করে না দাদা, আর তুমি বাপ হয়ে—

—থাম বিন্দু, তুই ও হারামজাদার সব খবর রাখিস কিনা, মেলা বকাসনে আমাকে। ভেবেছে, ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পাবে না। বাছাধন তো জানে না—পাপ আর পারা চাপা থাকে না।

নীরেনের বোন দাদার কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। কণ্ঠে উৎকণ্ঠা মিশিয়ে জিগ্যেস করলেন—এ সব তুমি কি বলছ দাদা? সত্যি যদি তাই হয়, তো তাতে হয়েছে কী? বামুনের মেয়েই তো বটে? কায়েত-শুদ্দুরের মেয়ের সঙ্গে তো ভাব করতে যায়নি সুধীর?

নীরেন মুখ বিকৃত করে কণ্ঠে ঝাঁঝ মিশিয়ে বললেন—তুই আর ওর হয়ে ওকালতি করতে আসিসনি বিন্দি। হলোই বা বামুনের মেয়ে। তাই বলে ওই ঠাকুমার বয়সী স্বভাবচরিত্তির খারাপ মেয়েটার সঙ্গে—

—চুপ করো দাদা, দোহাই তোমার, চুপ করো। নিজের মুখে নিজে আর চুনকালি দিও না। হাজার হোক, তোমারই ছেলে। কি সব সত্যি মিথ্যে শুনেছ, ভগবান জানেন, কিন্তু দুপুর বেলায় ছেলেটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে ভাল করলে না।

আর কথা না বাড়িয়ে নীরেন তাড়াতাড়ি গায়ে জামাটা গলিয়ে অফিসে বেরিয়ে পড়লেন। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে সাহস হল না তাঁর। আড়চোখে দেখে নিয়েছেন, সেখানে মেঘ জমেছে থমথমে। সামান্য আঘাতেই প্রবল বর্ষণ সুরু হতে পারে।

বিন্দুবালা রেগে গজ গজ করতে করতে অন্যদিকে চলে গেলেন। এ সংসারে আর থাকবেন না তিনি। এতদিন নিরুপায় হয়েই পড়েছিলেন। এখন ছুটো ছেলে সেয়ানা হয়েছে। লেখাপড়া করেনি বেশী। বিনা মাইনেয় ক্লাস এইট অবধি পড়েছে বড়টা। ছোটটা অতদূরও এগোয়নি। ফেল করেছিল বলে ফ্রি হয় নি আর। পড়াশুনোও বন্ধ হয়ে গেছে। সুতোর কলে ঢুকেছে ছুজনে মাস কয়েক হল। হপ্তায় ছুজনে বত্রিশ টাকা রোজগার করে। তিনি আলাদা বাড়ী ভাড়া করে থাকবেন। অশান্তি আর সহ্য হয় না। স্বামীর ভিটেটুকু বেচে ভায়ের কাছে এসে উঠেছিলেন তিনি চার চাবটে ছেলেমেয়ে নিয়ে। ছোটদাদা ধীরেন তাঁব সর্বনাশ করে গেছে। স্বামীব ভিটে বেচা দশহাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। সে আজ এক যুগ আগেকার কথা।

দাদাব সংসারে গলগ্রহ হয়ে ছিলেন বিন্দুবালা। একটি দিনের জন্যেও মনের শান্তি ছিল না তাঁর। দাদার সংসারে পুষ্যি কম নয়। অভাবেব সংসারে এসে অভাব আরও বাড়িয়েছিলেন তিনি। দাদা যথেষ্ট করেছেন। তাঁর ঋণ শোধ করা যাবে না। আর ঋণ বাড়াতে চান না তিনি। খুদ কুঁড়ো ছেলেরা যা আনে তাই ফুটিয়ে দেবেন তাদের। ভালোয় ভালোয় পথ দেখে নেবেম এবার। ছেলেরা কাজ থেকে ফিরুক। আজই ওদের ঘর ঠিক কবতে বলবেন।

সুধীর পথে এসে দাঁড়াল। তার অবস্থা দাঁড়াল ঠিক সাগর সঙ্গমে নবকুমারের মত। পরের জন্যে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে নবকুমার বিপদে পড়েছিল। সুধীরেব বিপদ তার চেয়ে কিছু মাত্র কম নয়।

কাঠফাটা রোদ্দুর, পেটে অসহ্য ক্ষিদে, বাড়ীতে ছু'মুঠো ভাতের কোন সম্ভাবনাই নেই। এখন সে কোথায় যাবে? সামনেই রোদ্দুরে ঝক ঝক করছে রেল লাইনগুলো। মৃত্যু

কয়েক হাত দূরেই। ঐ তো ডাউন ট্রেনখানা আসছে কাকনাড়া থেকে। একটু পা চালিয়ে গেলে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে গিয়ে পৌঁছে যাবে। লাইনের ওপর শুধু গলাটা পেতে দিতে যা বাকী। তারপর সব জ্বালার পরিসমাপ্তি।

সুধীর এগুতে লাগল সাহেব বাগানের পথ ধ'রে। গাড়ীখানা ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছ অবধি এসে গেছে।

না থাক। এ পাগলামী থাক। সে শেষ চেষ্টা করে দেখবে। এই তো সবে জীবনে দুঃখের সুরু। এরই মধ্যে জীবনে সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে কেন। জগতের বেশীর ভাগ লোকের দুঃখই তো তার চেয়ে অনেক বেশী। তারা তো দিব্যি বেঁচে আছে। যে ভাবেই হক।

যে ভাবেই হক বাঁচা চাই। বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে এক্ষুণি তাকে কিছু খেতে হবে। এ জন্যে কোথাও তার যাওয়া দরকার। এখন সে কোথায় যাবে ?

ছাব্বিশ নম্বর রেল গেটটা পেরিয়ে সুধীর উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলছিল বড় রাস্তার দিকে। হঠাৎ মনে হল, বিমলের দোকানে যাওয়া যাক। এক কাপ চা, একটা পাউরুটি খেয়ে পেটের জ্বালা নিভুতে হবে। এখান থেকে বিমলের দোকান মাইল খানেকের কম নয়। পকেটে আটটা নয়া পয়সা থাকলে বাসে যাওয়া যেত। উপায় নেই। হেঁটেই যেতে হবে। তাই সই।

রজনী সিনেমার পাশটাতেই বিমলের চায়ের দোকান। বড় রাস্তা আর ঢ্যাবঢেবে ঘাটের সংযোগস্থলে। খেয়া পারাপারের রাস্তা আর সিনেমা পাশে বলে বিমলের দোকানে খদ্দেরের ভীড় সব সময়েই। পাশেই বাস আর রিক্সাস্ট্যাণ্ড। দুপুরে রিক্সাগুলো স্ট্যাণ্ডে রেখে অনেক রিক্সাঅলা বিমলের দোকানে ঢুকে পড়ে। খদ্দের ডাকাডাকি করলেও তারা দোকান থেকে নড়ে না। তারা চা খায়, বিড়ি খায়, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নিজেরা বলাবলি করে,—মর শালারা ডেকে, আমরা উঠছি না। রোদ্দুরে জান

কবুল করে যাই, শালারা ঠেকাবে হয়ত তিন গণ্ডা পয়সা। ছ' আনা চাইলে বাঞ্চতরা বাসে গিয়ে উঠবে ধস্তাধস্তি করে। মার্ গুলি।

বিমল পার্টির লোক। জগদ্দল এলাকায় বিগত পৌরসভা নির্বাচনে সে ইউ. পি. বি. প্রার্থী ছিল। সুধীরকে সেই অবস্থায় দেখেই বিমল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সুধীরের বাড়ীর কথা তার কিছুই অজানা নয়।

বিমল জিগ্যেস করল—কি, খাওয়া হয়নি তো এখনও?

—না, এক কাপ চা আর একটা পাউরুটি দাও তো বিমল। আগে বাঁচি, পরে কথা।

বিমলের হাত থেকে পাউরুটিটা নিয়ে খেতে লাগল সুধীর। চা হতে তর সইছিল না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। শুকনো গলা দিয়ে সেটা নামতে চাইছিল না। বুকে গিয়ে আটকে গেছে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছিল তার। তাড়াতাড়ি এক কাপ চা তার দিকে এগিয়ে দিল বিমল।

চা খেয়ে সুস্থ হয়ে বিমলকে বলল—তোমার দোকানেই আমাকে থাকতে হবে কটা দিন। বাবা ডেকে না পাঠান পর্যন্ত।

বিমল সংক্ষেপে বলল—অক্লেশে।

বিমলের দোকানেই এক এক করে এক সপ্তাহ কেটে গেল সুধীরের। দিনে ওর উনানেই দু'মুঠো চাল ফুটিয়ে নেয় সে। আলুপটল সেদ্ধ আর ভাত। তার সঙ্গে পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। বড় জোর পাশের দোকানের সকালবেলাকার ভাজা দু'পয়সার ফুলুরি কোন কোনদিন। বিমল যখন বাড়ী চলে যায় খেতে, তখন সে রান্না আর খাওয়ার পাট সেরে নেয়। বিমলই জোগাড় করে দেয় চাল, আনাজপত্র।

সুধীর ভেবেছিল, পরদিনই বাবা ভাইকে দিয়ে ডেকে পাঠাবেন। খোঁজ নিলে জানতে ঠিকই পারতেন, সে আতপুরে রয়েছে বিমলের দোকানে। একটি একটি করে সাতদিন কেটে গেল, তবু কারো

দেখা নেই। বুক থেকে নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। তাহলে সে কি বাড়ীর কেউ নয়? মা, বাবা এতখানি স্বার্থপর? স্বার্থের নিক্তিতে স্নেহ বিক্রয়ই দুনিয়ার তাবৎ লোকের পেশা?

কাজ চাই। চাকরী একটা যেভাবেই হ'ক, যোগাড় করতে হবে। কত চেনা-শোনা লোক আসে বিমলের দোকানে। সুধীর করুণ স্বরে তাদের সবাইকেই বলে—আপনারা থাকতে আমাকে কী না খেয়ে মরতে হবে?

—না, না, সেকি! আচ্ছা, দেখছি দাঁড়াও।

কেউ কোন আশ্বাস না দিয়ে বলেন—শালারা যা টাইট দিয়েছে আজকাল, নইলে জুটমিলে আবার কাজের অভাব? ষোলটাকা হপ্তার চাকরী তো হামেশা এই সেদিনও মিলেছে।

—দেখুন দাদা, বদলি-টদলি যা হোক কিছু একটা—

—ভাল কথা বলেছ। বদলিতে চেষ্টা করলে হতে পারে। পরে সুযোগ সুবিধে দেখে—

এমনি ভাবেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে সুধীর। কতদিন আর বিমলের ঘাড়ে চেপে থাকা যায়। এই দোকানের আড্ডাটুকুই ওর ভরসা। দু'বেলা সে মাড়াতে সুরু করেছে জুটমিলের বাবুদের বাড়ীতে।

শেষে একদিন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ায় একটি মাসখানেকের বদলীর কাজ পেল সুধীর। ম্যাট্রিকটা পাশ করা ছিল। জুটেছিল কেরাণীর কাজ। বেতন আশী টাকা। এইটাই আপাততঃ তার কাছে আটশো টাকার সামিল।

জুটমিলে স্টাফ অনেক। এক আধজন নানা কারণে প্রায় সব সময়েই ছুটি নিয়ে থাকে। একমাস টেনে টেনে মাসের পর মাস চলতে পারে। যদি কপাল ভাল হয়, তাহ'লে পার্মানেণ্ট হয়ে যেতেও পারে। ভবিষ্যতে যাই হোক, আপাততঃ সুধীর খানিকটা নিশ্চিন্ত।

মাসের শেষে মাইনেটা হাতে পেয়েই সুধীর তার কর্তব্য স্থির করে নিলে। মায়ের হাতে প্রথম উপার্জনের টাকা দিতেই হবে। এতদিন ওঁরা খোঁজখবর না নিন, সেজন্যে কেউ পর হয়ে যাননি।

মায়ের হাতে নোট কখানা তুলে দিতেই তিনি কেঁদে ফেললেন। চোখের জল মুছে বললেন—পেটে ধরেছি ব'লে কি এতখানি শাস্তি দিতে আছে রে?

—কেন মা?

—মলুম কি বাঁচলুম, এই দুটো মাস খোঁজ নিয়েছিলি? বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছিস ব'লে কি আর এদিকে মাড়াতে নেইরে? তোর বাবা না হয় সংসারের শতেক জ্বালায় জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলেছেন, তা বলে তুই কোন্ প্রাণে বাইরে থেকে গেলি?

—তোমাদের ছেড়ে ত আমি থাকতে চাইনা মা। বল, এক্ষুণি থেকে যাচ্ছি।

—ও আমার পোড়াকপাল, এ আবার বলতে হবে কিরে? কই, যা দেখি, তোর কতখানি সাধ্যি?

মাকে জড়িয়ে ধ'রে সুধীর বালকের মত বলে উঠল—যার মা নেই, তার পৃথিবীতে কেউ নেই।

মা চোখের জল আবার মুছলেন। কান্না-ভেজা গলায় বললেন—তোর একটা হিল্লে হ'ল, বাঁচলুম বাবা। মা ব্রহ্মময়ীকে ষোল আনা মানসিক করেছি। মা মুখ তুলে চেয়েছেন এতদিনে। এই টাকা থেকে কালই পূজো দিয়ে আসব।

—সে তুমি করো তোমার যা খুশী।

বাড়ীতেই থেকে গেল সুধীর। বাড়ীতে থেকেই যাতায়াত করছিল অফিসে। পায়ে হেঁটে। রাস্তা কম নয়। দেড় মাইল করে মাইল তিনেক আসা-যাওয়ার পথ। বাস আছে, কিন্তু ভাড়াটা বাঁচানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

একদিন মা বললেন—আর কিছু না হ'ক, বোনটাকে বিয়ের কর দেখি। এত তোর জানাশোনা, একটা কানা খোঁড়াও কি জোটাতে পারিস নে?

একটু চিন্তা করে সুধীর বললো—পাত্র আছে মা। পছন্দ হবে?

সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মন হিসেবী হয়ে উঠল। জিগ্যেস করলেন—কেমন পাত্ররে? করে কি?

—পান বিড়ির দোকান। আয় মন্দ নয়।

—তা হোক। ব্যবসা কিছু নিন্দের নয়। তুই চেষ্টা করে দেখ বাবা, তোর বাবাকে আমি বলে দেখি।

—বাবাকে রাজী করাও, তারপর আমি আছি।

বহুদিন সুধীরের দেখা হয়নি উমার সঙ্গে। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল সুধীরের, একথা মিথ্যে নয়। কিছুদিন কাজে-অকাজে সুধীর-উমা জুটিকে পথে-ঘাটে, জলসা-সিনেমায় একত্র দেখা গেছে। উমা ইচ্ছে করেই সুধীরকে আঁকড়ে ধরছিল। নরেশকে এড়াবার জন্যে। তাঁকে বোঝাবার জন্যে যে, তাঁর লালসার ইন্ধন হতে সে আর চায় না। কোন কিছুর প্রলোভনেই নয়।

উমার সঙ্গে আজ দেখা করা দরকার। এখন সে গেছে নৈহাটিতে টিউশনি করতে। ফিরতে তার রাত্রি আটটা বাজবে। স্টেশনে গেলে দেখা হবে তার সঙ্গে।

ডাউন প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তে ঢালের কাছটাতে ঘাসের ওপর বসেছিল সুধীর। আলো-আঁধারী জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। অনবরত ট্রেন আসছে, যাচ্ছে। লোকের যাওয়া আসারও বিরাম নেই তাই। কিন্তু সে সামান্য সময়ের জন্যে। তারপরই জায়গাটা আবার জনবিরল হয়ে আসছে।

বসে বসে ঘাসের ডগা দিয়ে দাঁত খুঁটছিল সুধীর। তার দৃষ্টি ছিল পাওয়ার হাউসের আকাশ সমান উঁচু চিমনীগুলোর লাল

বাতির দিকে। অন্নপূর্ণা মিলের ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল। ডাউন ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল। এই ট্রেনেই উমার ফেরবার কথা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রেনখানা স্টেশনে এসে থামলো। নৈহাটী লোকাল। ভীড় বেশী নেই। সামান্য ক'জন মাত্র নামল গাড়ী থেকে। এখান থেকেই লক্ষ্য করলো সুধীর, উমা নামল কিনা। ট্রেনের পেছন দিকেই উমার ওঠা উচিত। সেইটেই সুবিধে।

কই উমা নামেনি ত? তাহলে হয়ত পরের ট্রেনে আসবে। এ ট্রেন সে ফেল করেছে নিশ্চয়।

কিন্তু ও কে নামল ট্রেন থেকে? অরুণা না? হ্যাঁ, অরুণাই তো। ওর গা ঘেঁসে কে যেন আসছে। নিশ্চয় অমর। সে ছাড়া অরুণার এতখানি ঘনিষ্ঠ হবার সাহস কার?

ভাল করে চেয়ে দেখে অবাক হলো সুধীর। অমর তো প্যাণ্ট পরে না কখনো। না, অমর নয়। কাছাকাছি আসতেই ওদের স্পষ্ট দেখতে পেল সুধীর। আলো-আঁধারী জায়গাটায় স্টেশনের নাম লেখা পাথরের প্লেটটার পেছনে বসেছিল সে। ওরা তাকে দেখতে পায়নি। অরুণার পিঠে বাঁহাত খানা রেখে হাসিখুশীতে উচ্ছল হয়ে আসছিল বিজিত। বিজিত মিত্র।

দীপার দাদা।

—অরুণা?

ওরা দুজনেই থমকে দাঁড়াল। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল, সুধীর বসে রয়েছে।

—ছিঃ অরুণা, এটা তোমার কাছে আশা করিনি। বিজিত, তুমি বোধ হয় জাননা—

অট্টহাস্য করে উঠলো বিজিত। হাসি থামিয়ে সে বললো—গত সপ্তাহে অরুণার সঙ্গে আমার রেজেষ্ট্রী ম্যারেজ হয়ে গেছে। অরুণা খুবই দুঃখিত, তোমাকে খবর দিতে পারেনি। সুধীরকে কাল চা খেতে যাবার নিমন্ত্রণ করে দাও অরুণা।

স্নিগ্ধ হাস্যে অরুণা বললো—শুনলে তো সুধীর। যেয়ো কাল। ভুলো না যেন।

তারপর ওরা চলে গেল দুজনে। সুধীর নির্ণিমেষ নয়নে ওদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

নারী চরিত্র দুর্বোধ্য। অরুণাকেও আজ ভয়ানক দুর্বোধ্য মনে হল সুধীরের। এই মাস দুয়েকের ভেতর কত কি ঘটে গেছে তার অজ্ঞাস্তে। অমরের সঙ্গে অরুণার বিচ্ছেদ যতখানি না বিস্ময়কর, বিজিতের সঙ্গে অরুণার মিলন তার চেয়েও। আশ্চর্য, সে তো কোনদিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। এ যে কল্পনাতীত। দেখা গেল, বাস্তব কখনো কখনো কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। বিচিত্র প্রাণের লীলা।

পরের ট্রেনেই উমা ফিরলো। সঙ্গে শশাঙ্কশেখর। উনি কলেজ থেকে ফিরছেন। এবার উঠে দাঁড়ালো সুধীর। কাছাকাছি এসে সুধীরকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো উমা। শশাঙ্কশেখরকে বললো—আচ্ছা, আপনি আসুন শশাঙ্কদা, আমার একটু কথা আছে সুধীরের সঙ্গে।

শশাঙ্কশেখর সহাস্যে ওদের দুজনার পানে একবার চোখ বুলিয়ে সামনের পথ ধরলেন।

উমা অভিযোগ করল—চাকরী পেয়ে বুঝি ভুলে গেছ? এ্যাদ্দিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, ব্যাপার কি?

—বসবে এখানে?

—এখানে নয় গঙ্গার ধারে চলো। এখন সেখানটা একেবারে নিরিবিলি।

—সেই ভাল।

স্টেশন থেকে গঙ্গার ধার বড় জোর তিন মিনিটের পথ। বড় রাস্তা পেরিয়ে টেগোর টেম্পল্ রোড ধরে ওরা গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁছতেই কালীবাড়ীতে নটার পেটাঘণ্টা পড়লো। নদীতে এখন ভরা জোয়ার। ওপারে সারি সারি আলো নিস্তরঙ্গ জলে

প্রতিফলিত হয়ে চমৎকার দেখাচ্ছে। পাল-তোলা খেয়া নৌকা যাত্রী নিয়ে পারাপার করছে খেয়াঘাটে। নদী শীতল স্পর্শ দিয়ে ওদের ক্লান্ত দেহ মন জুড়িয়ে দিলে।

এ পাশে তিনটি শিব মন্দির। কোণে স্বর্ণ-চাঁপার বিরাট একটা গাছ। চাঁপার মৃদু সৌরভ ছুটোছুটি করছিল জায়গাটায়। ওপাশে নহবৎখানা। সমান ঘাসের আস্তরণ বিছানো বিরাট প্রাঙ্গণ। গঙ্গার বুক থেকে ধার বাঁধানো অনেকখানি উঁচু জায়গাটা। প্রায় দুতলার সমান উঁচু। ধার ঘেঁসে ওরা দুজনে বসল বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে।

—অরুণার খবর শুনেছ ? প্রথমে কথা বললো সুধীর।

—শুনেছি। এখনো খবরটা বেশী ছড়ায়নি, তাহলে গ্রামটা তোলপাড় হয়ে যেত। সে যাক, কেমন চাকরী করছ বল ?

—বদলীর কাজ। ভরসা কিছু নেই তেমন। তবে করছি, সবাই যেমন করে।

—করো মন দিয়ে। তারপর একটু চুপ করে থেকে উমা বললো—একটা খবর শোনোনি ?

—কি খবর ?

—আসছে শনিবার মহিলা-সমিতি সম্বর্ধনা জানাচ্ছে সুনির্মলকে।

—তাই নাকি ? সুখবর। সুনির্মল আমার সহপাঠি। তার গৌরবে সকলের গর্ব হওয়া স্বাভাবিক।

—পরের দিন নাগরিক সমিতি সম্বর্ধনা জানাচ্ছে।

—ভাল খবর দিলে। দুটোতেই উপস্থিত থাকতে হবে আমাকে।

—আশ্চর্য।

—কেন ?

—না, কিছু নয় এমনি।

উমা ভেবেছিল, সুনির্মলের সম্বর্ধনার কথা শুনে সুধীর হয়ত চুপ করে ভাবতে থাকবে, তার সহপাঠির কতখানি সৌভাগ্য।

বিলেত থেকে স্পেশালিষ্ট হয়ে এসেছে বাপের টাকার জোরে। গ্রামের মহিলাদের পক্ষ থেকে তাকে মাল্যভূষিত করা হবে। মানপত্র দেওয়া হবে। এ সব ছাড়াও নাগরিক সমিতি তাকে নাগরিকদের আন্তরিক প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ মূল্যবান উপহার দেবে। এসব কথা শুনে সুধীর হয়ত ঈর্ষান্বিত হবে। উমা অবাক হল দেখে, খবরটা শুনে সুধীর খুব খুশী হয়েছে। এ তার অন্তরের একটা ছলমাত্র নয়, বন্ধুর সৌভাগ্যে নিজেকেই সে সত্যিকারের ভাগ্যবান বলে মনে করছে।

উমাকে চুপ চাপ দেখে সুধীর জিগ্যেস করল—কিছু বলছ না যে?

উমা আরো কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল—নরেশদা আমাকে পাঁকের মধ্যে ডোবাতে চেয়েছিল সুধীর। তুমি সেখান থেকে আমায় উঠে আসতে সাহায্য করেছ। তোমার ঋণ ভোলবার নয়।

—এ কথা বলছ কেন উমা?

—না সুধীর, সত্যি কথাই বলছি। কিন্তু গায়ে পাঁক যে আমার থেকেই গেল।

কৌতুক করে সুধীর বললো—সামনেই পতিতপাবনী, স্নান করে নিও, সব পাঁক ধুয়ে যাবে।

উমা গম্ভীর হয়ে বলল—ওতে আমার বিশ্বাস নেই।

—আমি যদি হই তোমার পতিত পাবন?

সহসা সুধীরের হাতদুটো নিজের দু'হাতের মুঠোয় চেপে ধরে উমা বললো—আমি তাহলে পবিত্র হবো সুধীর। ঐ গঙ্গার মতই।

সুধীর অনুভব করলো, উত্তেজনায় উমার হাতদুটো কাঁপছে। সে ধীরস্বরে বললো—তাই হবে।

।। তেরো ।।

মহিলা সমিতির সভ্যারা আজ ভয়ানক ব্যস্ত। ডাঃ সুনির্মল ব্যানার্জীকে তাঁরা অভিনন্দন জানাবেন। সকাল থেকে তার তোড়জোড় চলেছে। সমিতির ঘরে এক হাঁটু ধুলো, ক্বাটা কাপড়ের কুচি ছড়ানো। সে সব ধোয়া মোছা হল। ফুলের মালা, ফুলদানি, ধূপ, ধূপদানী, টেবিল ক্লথ যোগাড় হলো।

মানপত্র লেখান, সভাপতি ঠিক করা, উদ্বোধনী সঙ্গীতের ব্যবস্থা সব পাকা হয়ে গেছে। জলযোগের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ঠাক্‌মা সভানেত্রী নির্বাচিতা হয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ খুব বেশী। ডাক্তারকে যে মানপত্রখানি বাঁধিয়ে দেওয়া হবে, সেটি তিনিই লিখেছেন।

সর্বজনীন ঠাক্‌মার নাম নিমন্ত্রণপত্রে মুদ্রিত হয়েছে। মনোরমা দেবী। ঠাক্‌মা এতে মনে মনে খুব খুশী হয়েছেন। বাড়ী বাড়ী গিয়ে মহিলাদের নিমন্ত্রণ করে আসছেন নিজেই। বলছেন, —ও অলকা, যাস ভাই, ঠাক্‌মার মুখ রক্ষে করিস। ছেলেমানুষ কতবড় ডিগ্রী নিয়ে আসছে বিলেত থেকে। সে যেন বাপু তোদের চাঁদ মুখগুলো দেখতে পায়।

—ছেলেমানুষ চাঁদ মুখের মর্ম কি বুঝবে ঠাক্‌মা?

—তুই আচ্ছা ঠকালি ভাই। তাহ'লে কথাটা শুধরেই নিচ্ছি। সেয়ানা ছেলে। বিলেতে আদব কায়দা শিখে এসেছে। এসে গাঁয়ের বৌ-ঝিদের যেন নিন্দে না করে ভাই। তোরা গিয়ে দাঁড়ালে ভরসা পাব। আমাকে আবার সভানেত্রী করেছে কিনা?

অলকা হেসে বলে, সে তো কার্ডে দেখেছি ঠাক্‌মা। যাব বৈক্কি, নিশ্চয় যাব।

এমনি বাড়ী বাড়ী গিয়ে ব'লে আসেন ঠাক্‌মা। বাড়ী ফিরে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলেন বাড়ীর সামনে রাস্তার ধারে রকের ওপর। মোটা-সোটা, গোলগাল মানুষ। এতখানি পরিশ্রম ক'রে এসে হাঁপিয়ে পড়েছেন। একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন ব'সে ব'সে।

সুধীর হন হন ক'রে সামনের পথ দিয়ে চলেছিল। আজ শনিবার। মিলের ছুটি। জরুরী কাজে চলেছিল অন্যমনস্ক হ'য়ে। ঠাক্‌মা ব'সে রয়েছেন, অতটা লক্ষ্য করেনি। খানিকটা দূর এগিয়ে গেছে সুধীর এমন সময় ঠাক্‌মা তাকে লক্ষ্য ক'রে ডাকলেন —বলি, সুধীর যাচ্ছ না?

সুধীর থমকে পেছন ফিরে তাকাল। এগিয়ে এলো পায়ে পায়ে হাসিমুখে। বললো—হ্যাঁ ঠাক্‌মা, আমি।

ঠাক্‌মা পা ছুটো ছড়িয়ে দিয়ে বললেন—কাজের ছেলে সব তোমরা, আমাদের ভুলে গেলে নাকি?

—না, না, একথা কেন বলছেন?

—বলছি কি সাধে? বসে আছি সামনে, আর তুমি কোন্ আক্কেলে সামনে দিয়ে হন্ হন্ ক'রে চলে যাচ্ছ ভাই? বলি, একে কি ভুলে যাওয়া বলে না?

—না, না ঠাক্‌মা, আমি অতটা খেয়াল করিনি।

—সে যাক্, তুমি তো ভাই মহিলা সমিতির জন্যে একদিন অনেক কাজ ক'রেছ। হিসেব পত্তরের খাতা লিখে দিয়েছ, চ্যারিটি ক'রে টাকা তুলে দিয়েছ, সরকারের কাছে লেখালেখি ক'রে টাকা আদায় ক'রে—

—না, এ আর আমি এমন কি ক'রেছি—

—না, না, সে বললে হবে না ভাই। আমি সব জানি। কে কাজের ছেলে আর কে অকাজের, আমার তা একরত্তি জানতে বাকী নেই। সে যাক্, আজ আসছো তো?

—সুনির্মলের সম্বর্ধনা সভায় তো?

—হ্যাঁ। আসা চাই কিন্তু। দ্যাখোনা, কী ফ্যাসাদেই ফেলেছে আমাকে। আমাকে সভানেত্রী করা কেন বলো দেখি ?

—আপনি ছাড়া আর কার যোগ্যতা আছে ঠাক্‌মা ?

ঠাক্‌মা কোন প্রতিবাদ না করে সুধীরকে জিগ্যেস করলেন—মানপত্রটা দেখেছ ? বললাম ওদের কত করে ; আমাকে দিয়ে লেখানো কেন বাপু। শশাঙ্কশেখরকে দিয়ে লিখিয়ে নে না, তা ছাড়ল না কিছুতেই। লিখতেই হল শেষে। জয়ন্ত নাগ সেটা আর্ট কাগজে ছাপার মত করে লিখে দিয়েছে। চমৎকার দেখতে হয়েছে।

—এখনো দেখিনি ঠাক্‌মা। ওখানে গিয়েই দেখব। পুরুষদের যেতে আপত্তি হবে না ত ঠাক্‌মা ?

—পুরুষদের কাউকে যেতে দেওয়া হবে না। এ একেবারে মেয়েদের নিজস্ব ব্যাপার। তবে তোমার কথা আলাদা। মহিলা-সমিতির পেছনে তোমার পরিশ্রম কম করতে হয়নি। তুমি যেও, কেউ মানা করবে না তোমাকে।

—আচ্ছা তাহলে যাব ঠাক্‌মা। অবশ্য আপনি না বললেও আমি যেতাম। সুনির্মল আমার বাল্যবন্ধু। তাছাড়া আমরা একসঙ্গে পড়েছি।

বিকেলে মহিলা সমিতির কার্যালয় সরগরম হয়ে উঠল। সারা গ্রামের মহিলারা যেন ঝেঁটিয়ে এসে হাজির হলেন। খানিকটা কৌতূহল। খানিকটা সংসার থেকে মুক্তির আনন্দ। এ হল বয়স্কাদের কথা। যুবতীরা এসেছে ডাক্তারকে দেখবার জন্যে। রংবেরংয়ের পোষাকে সেজে এসেছে তারা এক একটি রঙীন প্রজাপতির মত। রকমারী প্রসাধনের উগ্র গন্ধে এখানের বাতাস ভরপুর।

অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় বেলা পাঁচটা। তার সামান্য দেরী। এদিকে আয়োজন সম্পূর্ণ। শুধু ডাঃ ব্যানার্জী এলেই হয়।

এমন সময় সুধীর এসে হাজির হলো সেখানে। সঙ্গে উমা। ওদের দুজনকে আসতে দেখে সমিতির সম্পাদিকা এগিয়ে এলেন। ভ্রূ কুঁচকে বললেন—কোনও ব্যাটাছেলেকে এখানে আসতে দেওয়া হবে না।

উমা জিগ্যেস করল—কেন?

সম্পাদিকা রূঢ়স্বরে জবাব দিলেন—এটা মহিলা-সমিতির অনুষ্ঠান। এখানে তুমি আসতে পারো। তোমার সঙ্গের ঐ উনি নন।

সুধীর শান্তস্বরে বললো—ঠাকুমার বিশেষ অনুমতি নিয়েই আমি আপনাদের সভায় যোগ দিতে এসেছি। যদি আপত্তি থাকে—

—একশোবার আপত্তি আছে। এখানে বয়স্ক মেয়েরা রয়েছে। ওকে ঢুকতে দিলেই পাঁচজন ঠেলাঠেলি করে ঢুকতে চাইবে, তখন?

গোলমাল শুনে ঠাকুমা ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। চওড়া পাড় শান্তিপুরী সাড়ী পরে এসেছেন। নাকে সুন্দর পাথর বসানো নাকছবি। পান খাওয়া টুকটুকে লাল ঠোঁট।

এসেই ঠাকুমা বললেন—কি হয়েছে? হ্যাঁ—আমি ওকে আসতে বলেছি, তোমরা তো এই কদিনের বাপু, মহিলা-সমিতির ও কতবড় বন্ধু জানো? কি না করেছে ও সমিতিকে দাঁড় করাবার জন্যে।

সম্পাদিকা আমতা আমতা করে বলতে গেলেন—কিন্তু ঠাকুমা, পুরুষ একজনকে—

বাধা দিয়ে ঠাকুমা বললেন—পুরুষ তাতে কি হয়েছে? পুরুষ না হলে একদিন চলে তোদের? যাকে অভ্যর্থনা জানাবি, সে কি মেয়েছেলে নাকি?

এই গোলমালের মধ্যেই একখানা মোটর এসে থামল গেটের সামনে। সম্পাদিকা এবং আরো কয়েকজন কমিটির সভ্যা দৌড়ে সেদিকে গেলেন। গাড়ী থেকে নামল সুনির্মল আর তার ছোট বোন সুতপা।

মেয়েরা তৈরী ছিল। সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ এবং উলুধ্বনি শোনা গেল। পরম সমাদরে স্থনির্মলকে নিয়ে গিয়ে ওঁরা বসালেন নির্দিষ্ট আসনে।

স্থনির্মলের বেশ ছিমছাম চেহারা। মুখখানার গড়ন সরু। চোখ দুটি বেশ টানাটানা। তবে বাবার মতই কপিশ বর্ণের চোখের তারা। হাসলে ওপরের পাটির দুপাশে দুটি গজদাঁত দেখা যায়। চালচলন আর কথাবার্তায় বেশ সপ্রতিভ।

ওঁদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল স্থনির্মল। কোনপাশে তার লক্ষ্য ছিল না। ঠাকুমাও সুধীরের কথা ভুলে গিয়ে স্থনির্মলের হাত ধরে চলে গেলেন। সুধীর ভাবছিল, ভেতরে যাবে কিনা। স্থনির্মল বাল্যবন্ধু, সহপাঠি। পাশেই সে দাঁড়িয়েছিল। চোখ তুলে একবার তার দিকে চেয়েও দেখল না সে। হয়ত লক্ষ্যই করেনি। কিংবা দেখেও না দেখার ভান করেছে। এড়িয়ে যাবার জন্যে। সুধীর চাইলো উমার পানে। অপরাধের হাসি হেসে বলল—আমার বোধ হয় ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে না এরপর। তুমি যাও, আমি এখান থেকে চলে যাই।

উমা সুধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—আমারও ভেতরে যেতে ইচ্ছে নেই, চল, দুজনেই চলে যাই এখান থেকে।

ওরা দুজনে বেরিয়ে এলো মহিলা-সমিতির প্রাঙ্গণ থেকে। ওদিকে তখন শোনা গেল, উদ্বোধনী সঙ্গীত স্থরু হয়ে গেছে, 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান।'

॥ চৌদ্দ ॥

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে এল। প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ভেতর কাটতে লাগলো দিনগুলো। না ছিল তাতে কোন নতুনত্ব, না কোন পরিবর্তন। সুধীরের জীবনে ঘুরে ফিরে একই দুর্যোগ বারে বারে হানা দিয়েছে। বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছে আরো কয়েকবার। আবার মায়ের পেড়াপীড়িতে তার ভাই অধীর গিয়ে ডেকে এনেছে তাকে।

বদলির চাকরী। মাঝে মাঝে কাজ হচ্ছিল। আবার মাঝে মাঝে বসেও থাকতে হচ্ছিল চুপ চাপ। বছর ঘুরতে চাকরীটা পাকা হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কয়েকজন পুরনো বাবু রিটায়ার করলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুযোগ হাতছাড়া হ'য়ে গেল। কোন এক-জনের শত্রুতার জন্যে সুধীর পাকা চাকরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। বদলি কোনীর সংখ্যা কম ছিল না। তাদের মধ্যে থেকে পরীক্ষা করে কজনকে নেওয়া হল। তাকে পরীক্ষায় বসতেই দেওয়া হল না। কানাঘুষোয় শুনতে পেল সুধীর, তার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের ধারণা ভালো নয়। সে নাকি একজন ডেঞ্জারাস চ্যাপ। শ্রমিক-মালিক বিরোধ পাকাতে তার জুড়ি নেই এ অঞ্চলে। তার সম্বন্ধে এই ধরনের কলমের খোঁচা দিয়েছেন গ্রামেরই একজন স্বনামধন্য পুরুষ।

আবার সেই বাউণ্ডুলে দশা। সারাদিন টো টো করে ঘোরা। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই।

সুধীর এতদিন ভাবেনি। কোনকিছুই গ্রাহ্য করেনি সে। নিজেকে নিজে যাচাই করে দেখেনি কোনদিন। অত্যন্ত সাধারণ বুদ্ধির ছেলে। থার্ড ডিভিসানে ম্যাট্রিক পাশ করে বেরিয়েই

দেশের দিকে তাকিয়েছিল সে। কোনও ভবিষ্যতের কথা ভাবেনি। কিসের একটা আকর্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কাজে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে সেদিন দেখা দিয়েছে দুর্যোগের ঘন কালো মেঘ। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী একটা অসম্ভব প্রস্তাব শোনালেন বাঙালীকে। বঙ্গবিহার অন্তর্ভুক্তি করণ। দেশের লোক চমকে উঠল ডাঃ রায়ের প্রস্তাব শুনে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের তীব্র বিদ্বেষ দেখা গেল খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্যে। এই সমস্ত কারণে কংগ্রেস তখন প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন। উনিশশো পাঁচ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মতই তা ব্যাপক হয়ে পড়ল সারা বাংলায়। আতপুর শ্যামনগর ছিল এই আন্দোলনের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি।

সুধীর খুব ঘনিষ্ঠভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেললো কাজের মধ্যে। ধীরে ধীরে তার সততা, কর্মদক্ষতা জনপ্রিয় করে তুললো তাকে। সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করে গেছে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে। সুধীর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছে, মার্কসবাদই জগতের একমাত্র সঠিক বৈপ্লবিক দর্শন। এই দর্শনের ধারক, এই মতবাদের বাহক তার মত শত শত নিষ্ঠাবান কর্মীর অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই দুনিয়ার মেহনতী মানুষের মুক্তি সম্ভব।

সুধীর ভেবে দেখেছে, নিজেদের গলদের কথা। এখন সে বেশ বুঝতে পারে। গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে। মার্কসবাদ গ্রহণ করার মত শিক্ষার বনিয়াদ থাকা দরকার। এই মতবাদে বিশ্বাসী মনগুলো সব ঠিকমত গড়ে ওঠেনি। ঠিকমত তৈরী না হয়েই অনেকে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাছাড়া কায়েমী স্বার্থকে হটাতে গেলে সকলের আগে চাই জনসাধারণের সমর্থন। সেই আশীর্বাদ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। সে দোষ কর্মীদেরও যেমন নেতাদেরও তেমনি। তাঁদের কষ্টসহিষ্ণুতা আছে শৃঙ্খলাবোধ আছে, নেই শুধু মার্কসবাদকে ভারতীয় আবহাওয়ায় সঠিকভাবে

প্রয়োগ করার মত মন। তাই চির-বিপ্লবীর রক্তঝরা বাংলায় সে বৃক্ষ শিকড় গাড়তে পারল না।

নিজের পানে তাকিয়ে সুধীরের মনে হয়, সব দিক দিয়েই যেন ব্যর্থ হ'য়েছে সে। তার আন্তরিকতার অভাব নেই তবু লক্ষ্য দূরেই থেকে গেল।

সুধীর নিজেকে যাচাই করে দেখতে আরম্ভ করেছে। এ কি হল? এ কি করলো সে? একটি বলিষ্ঠ নীতি কোথায় তাকে ওপরে টেনে তুলবে। তার বদলে তাকে ভূতলশায়ী করে দিচ্ছে বার বার। জীবনে এতখানি ব্যর্থ হবার মতো ছেলে তো সে নয়। তাহলে?

না, মাথা সে নত করবে না। কারো কাছেই নয়। গায়ের ধূলো ঝেড়ে সে উঠে দাঁড়াবে। জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, একথা কেন বিশ্বাস করবে সে?

উমাকে সে মর্যাদা দিয়েছে। এইটুকুই তার সাধ্য ছিল। নরেশ যাকে উপপত্নী হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন, তাকে সে গ্রহণ করেছে স্ত্রী হিসেবে। তার বাবা, মা, সংসারের তাবৎ মানুষ বুঝুক, ধনে-মানে যাঁরা সমাজের উচ্চমঞ্চ জাঁকিয়ে বসে আছেন, তাদের ভেতর গলদ কত। উমার মত মেয়েরা বাঁচবার তাগিদে, ঐশ্বর্যের স্বাভাবিক আকর্ষণে অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পুড়ে মরার আকাঙ্ক্ষা পতঙ্গের নয়। কখনোই নয়। সে বাঁচতে চায়। আগুনে ঝাঁপ দিলে মরবে, আগুনই সেকথা তাকে ভুলিয়ে দিয়ে কাছে টানে।

লোকে কিন্তু ছি, ছি করে। নিজে যে নিজের পেট চালাতে পারে না, তার আবার বিয়ে করার শখ কেন?

উমা কি সেকথা ভাবেনি। উদয়াস্ত টিউসিনী ক'রে সে কোনমতে নিজেরটা নিজে চালিয়ে নিচ্ছে। সুধীরের কাছে নিজের অন্নবস্ত্রের প্রত্যাশা ক'রে সে তাকে জীবনে বরণ করেনি। সে চেয়েছে সুধীরকে আঁকড়ে ধ'রে সসম্মানে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে।

অন্তরে সে গভীরভাবে বিশ্বাস করেছে, সুধীর তার কলঙ্কিত অতীত জীবনটাকে ধুয়ে মুছে পরিশুদ্ধ ক'রে নেবে একনিষ্ঠ ভালবাসা দিয়ে। সে জানতো, সুধীর ছাড়া এ কাজ আর কেউ পারবে না। সুধীরের ভেতর যে একটা মানুষ আছে, সেটা প্রত্যক্ষ ক'রেছে চরম দুঃখের মধ্যে। তাকে আঘাত দিয়ে জেনেছে। তাকে ভালবেসে জেনেছে। তাকে পরিপুর্ণ লাভের মধ্যে জেনেছে।

এই সময়ে উমার বাবা মারা গেলেন। সংসারের চাকা জোড়াতালি দিয়ে চলছিল কোনরকমে। এবার একেবারে যেন থেমে যেতে চাইল। সুধীরকে একদিন উমা জিগ্যেস করল—বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা কিছু নিয়ে একটা ব্যবসা করলে হয় না?

—মার মত আছে কিনা জিগ্যেস কোরো।

উমার মা বেঁকে বসলেন শুনে। বললেন—আমার ইচ্ছে, তোমার দিদিদের পার করো। অদৃষ্টে যা আছে হবে তারপর।

উমার বড়দি বেঁকে বসলো বিয়ের কথা শুনে। বয়স ছত্রিশ পেরিয়ে সাঁইত্রিশ চলছে। সমস্ত শরীরটা যেন কাঠের মত হ'য়ে গেছে। এ বয়সে আর বিয়েতে রুচি নেই। সেলাই-ফোঁড়াই শিখেছে মহিলা সমিতিতে। সার্টিফিকেট আছে। চেনা জানা লোকের জামা, সায়া, ব্লাউজ, ফ্রক ক'রে দেয়। যা আয় হয়, তাতে তার একার পেট চলে যায় নির্ভাবনায়।

মেজদি শুনে মুখ টিপে হাসলো। হাসলে টোল পড়ে গালে। শ্যামবর্ণ, দোহারা গড়ন, মুখ চোখ মন্দ নয়। উমার চেয়ে দেখতে অনেক ভাল। লাবণ্য আছে শরীরে এখনো। বয়স তেত্রিশ চৌত্রিশের কম নয়। হেসে বললো—আর কেন?

সুধীর বললো—ছোট ভাইয়ের পর বড় ভাই যেমন হামেশা বিয়ে করে, তেমনি ছোট বোনের পরও—

উমার মেজদি বাধা দিয়ে বললেন—থাক, থাক, আমরা বাইরে বেরুতে পারলে অমন এক আধটা অনেকদিন যোগাড় করতে পারতুম। শুনে উমা আর সুধীর দুজনেই চমকে তাকাল তার

দিকে। তারপর সুধীর জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে উমার মুখের দিকে চাইল।

উমা স্থির দৃষ্টি মেজদির মুখের ওপর রেখে জিগ্যেস করলো—কি বললি মেজদি?

—যা বলেছি, শুনেছিস ঠিকই। এও বলি, আমরা তোর মত এমন একটা বাউণ্ডুলেকে যোগাড় করতুম না।

—আঃ কি যা তা বলছিস মেজদি?

সহাস্যে সুধীর বললো—মেজদি ঠিকই বলেছেন। ওঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। আমি বাউণ্ডুলে ছাড়া আর কি?

—যাকে লক্ষ্য ক'রে তুই একথা বলতে পারলি, মানুষ হিসেবে সে যে কত বড়, সে কি তুই জানিসনে মেজদি? সে যাক্, তোকে করতেই হবে বিয়ে।

—ভেবে দেখতে হবে।

—তুই ভাবতে থাক, আমরা এদিকে পাত্র দেখি।

শ্বশুরের অফিসে কয়েকদিন যাতায়াত করেছে। উমার পরের বোন রুমা এবার ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছে। বেশ চটপটে। যদি তার একটা চাকরী হয়, তাহ'লে সংসারটা দাঁড়াতে পারে।

শ্বশুরের সহকর্মীরা এজন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। সুধীর গিয়ে খবর নিয়ে আসে মাঝে মাঝে। তাঁরা আশ্বাস দিয়ে বলেন—আপনি কিছু ভাববেন না, এটা আমাদেরও ত একটা কর্তব্য! শ্রীপতিদার সংসার আমরা পাঁচজন থাকতে ভেসে যাবে, এ কি একটা কথা?

হাত দুটো কচলাতে কচলাতে সুধীর বলে—অশেষ ধন্যবাদ। আপনাদের ভরসাতেই ওঁরা আছেন।

সরকারী অফিস। মহিলা কর্মীর সংখ্যা কম নয়। এঁরা ইচ্ছে করলেই রুমার একটা চাকরী হ'য়ে যাবে। রুমা লেখাপড়া শিখেছে। তাই, বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে চালিয়ে নেবে ঠিক।

সেদিনও সুধীর গিয়েছিল খবরাখবর নিতে। অফিসে কত লোক কাজ করছে। মস্ত বড় বড় টেবিল। সুদৃশ্য চেয়ার। টেবিলে স্তূপীকৃত ফাইল। দোয়াত কলম, পিন-কুশন, বেল। মাথার ওপর বন্ বন্ করে ফ্যান ঘুরছে। চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে সকলের পোষাক পরিচ্ছদ। পরিপাটী ক'রে শেভ করা পুরুষদের মুখ। মহিলাদের বেশভূষা স্বভাবতঃই আরো বেশী। রকমারী তাদের সাড়ী ব্লাউজ, গয়না। প্রসাধনে সুতীব্র জৌলুষ। নিশ্চিন্ত আয়ের ফলে কত সুখী এরা। রাজনীতি এরা করে হয়ত, সে এদের সৌখিন বিলাসিতা। সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে নয়। এরা মা, বাবাকে দুঃখ দেয়নি তার মত। এরা ভাই বোনদের মানুষ করে। নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থেকে নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করেই তারা সার্থক।

ভিজিটারদের টেবিলে বসে বসে দেখছিল সুধীর। রুমা এই অফিসে চাকরী করবে। ওই সব সাজ গোজ করা মহিলাদের মত আসবে ঝকঝকে পোষাকে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে। মুখে কড়া প্রসাধনের প্রলেপ বুলিয়ে। হাতে রিষ্টওয়াচ আর ভারী ভারী গয়না পরে। সে বেশ ভাল হবে।

একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক সুধীরের কাছে এলেন। মনের একরাশ চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সুধীর চেয়ারটা টেনে নিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে বসল।

ভদ্রলোক বললেন—ব্যবস্থা সব একরকম পাকা। আপনি পরশু শ্রীপতিদার মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসুন। আমাদের অফিসার তাকে পরীক্ষা ক'রে তবে স্যাংসনের জন্যে ওপরঅলার কাছে লিখবেন।—

—পরীক্ষা ?

—হ্যাঁ, তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। ও একটা মামুলি ধরণের আর কি। স্যাংসন আসার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপোয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যাবে।

—সে কতদিন লাগবে ব'লে মনে হয় ?

—এই ধরুন মাসখানেক।

—আচ্ছা। আপনি আমাদের জন্যে অনেক করলেন। আপনাকে কি ব'লে যে—

—থাক থাক, আচ্ছা তাহ'লে ঐ কথা রইল। নমস্কার। আসুন আপনি।

অফিস থেকে বেরিয়ে পথে পা দিল সুধীর। মহানগরী কলকাতা। দিনের বেলায় এই মহানগরীর সবচেয়ে কর্মমুখর অঞ্চল হ'ল ডালহৌসী এলাকা। ট্রামে, বাসে, মোটরে, মানুষে কিলবিল করছে। নেতাজী সুভাষ রোডের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুধীর এসে পৌঁছল বড়বাজারে। কি ঘিঞ্জি কলকাতার এই এলাকাটা। মহাত্মা গান্ধী রোডের দু'পাশে জমকালো সব দোকান। পয়সা ফেললে কি না পাওয়া যায় এখানে। কারা সব এই দোকানগুলোর মালিক ? এখানটা ঘুরে দেখলে তো মনেই হয় না এটা বাংলা দেশ।

ফুটপাত ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে চলেছিল সুধীর। বিশ্রী নোংরা জায়গাটা। স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত জঞ্জাল। যানবাহনের গাঁদি লেগে গেছে যেন। ঠেলা গাড়ি আর রিক্সাই রাস্তা প্রায় অবরোধ ক'রে আছে। তার ওপর আছে এখানে সেখানে ধর্মের ষাঁড়গুলো রাস্তা আগলে। দু'পা হাঁটতে গেলে দশবার ধাক্কা খেতে হ'চ্ছে।

অবাক হ'য়ে তাকাতে তাকাতে চলেছিল সুধীর। হঠাৎ তার সামনে একটা রিক্সা আরোহী সমেত বাঁক নিল বাঁদিকের রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এক পলক মুখটা দেখতে পেয়েছে সে আরোহীর। চোখে সানগাগ্‌ল। মাথায় মস্ত বড় টাক। চেহারা আগের মত নেই। বেশ ভারী গোল-গাল চেহারা। ধীরেন কাকাকে চিনতে তার ভুল হয়নি। ধীরেন কাকার কথা সবাই প্রায় ভুলতে বসেছে। বেঁচে আছে কি নেই, তার খোঁজ রাখেনি কেউ এই বারো বছর।

হন্ হন্ ক'রে ছুটে চলেছিল রিক্সাটা। সন্দেহ দূর করবার জন্যে সুধীর ছুটল রিক্সাটার পিছনে পিছনে। এগিয়ে গিয়ে ভীড়ের আড়ালে থেকে দেখল মানুষটিকে। খুব কাছে থেকে। হ্যাঁ, ধীরেন কাকাই বটে। কোনো ভুল হয়নি তার চিনতে। সুধীর দেখল, ইয়া ইয়া গালপাট্টাঅলা গুণ্ডা গুণ্ডা চেহারার লোক তাঁকে দেখেই হাত তুলে নমস্কার করছে। কাকা তাহ'লে এখানের একজন কেষ্ট-বিষ্টু গোছের লোক। গুণ্ডারাও সমীহ করে তাঁকে দেখে।

ডাকবে নাকি কাকাকে? এখানে তাঁর কত চেনাশোনা বড় বড় লোক আছে। কত তাঁর খাতির। তিনি নিশ্চয়ই তার একটা কাজকর্ম ক'রে দিতে পারবেন। বেকার হ'য়ে বসে আছে সে। কাকাকে সব দুঃখের কথা জানালে একটা কিছু ব্যবস্থা তিনি ক'রে দেবেনই।

কিন্তু না, আজ থাক। শুধু কাকার বাসাটা সে আজ দেখে যাবে। দূর থেকে ঠিকানাটা লিখে নিয়ে যাবে। পরে আসবে আবার। আজ শীগ্‌গীর ক'রে বাড়ী ফেরা দরকার। রুমাকে খবরটা দিতে হবে। যতই মামুলি হ'ক, পরীক্ষায় যেন সে উত্তীর্ণা হয়। রুমা যেন প্রমাণ করতে পারে, শ্রীপতিবাবুর মেয়ের পরিচয় ছাড়াও চাকরী পাবার যোগ্যতা আছে তার।

রিক্সাটা পিচের রাস্তা, ইঁটপাতা গলি ছাড়িয়ে এঁকে বেঁকে অনেকদূর গিয়ে একটা বাড়ীর সামনে থামল। যে গলিটায় বাড়ীটা, সুধীর চেয়ে দেখল, সেটার নাম রঘুনন্দন লেন। গলিটা ডানদিকে যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেই মোড়ে বাড়ীখানা। দোতলায় কাঠের ফ্রেমের ঘর। ওপরে টিনের আচ্ছাদন। বেশ লম্বা বাড়ীটা। দু'পা এগিয়ে বাঁদিকে একটা পানবিড়ির দোকান। এখানে সেখানে ছাই, তরকারীর খোসা, ডিমের খোলা, কাটা ডাব আর মাংসের হাড় ছড়ানো। একটা দূষিত গন্ধ বাতাসটাকে ভারী ক'রে রেখেছে। পানবিড়ির দোকানটায় একটা গ্রামোফোনে

পুরনো রেকর্ড বাজছে নাকী সুরে। বাড়ীটা থেকে ভেসে আসছে বিচিত্র কলরব।

ধীরেন রিক্সা থেকে নেমে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে সোজা বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। একটু পরেই সুধীর তাঁকে দেখলো সামনের দিকে দোতলার সেই কাঠের বারান্দায়। যাক, নিশ্চিন্ত। ঠিকানাটা তাড়াতাড়ি টুকে নিয়ে সেখান থেকে চলে এল সুধীর। জায়গাটা যে মোটেই সুবিধের নয়, সে বুঝতে পেরেছে। বেশ্যাপল্লীও হ'তে পারে। ছি, ছি, কাকা এমন জায়গায় কেন থাকেন কে জানে। কলকাতায় কি আর থাকবার জায়গা নেই ?

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে শিয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছে গেল সুধীর। একখানা লোকাল ট্রেনে গিয়ে ভীড় ঠেলে উঠে পড়ল। গাড়ীখানা ছাড়বার সময় হ'য়েছে।

সারা রাস্তা দাঁড়িয়ে আসতে আসতে সুধীর ভাবছিল নিরুদ্দিষ্ট মানুষটির কথা। এত কাছেই রয়েছেন, তবু একদিন গিয়ে খোঁজ খবর নেননি তাদের। মানুষ এমন পাষাণ হয় ?

॥ পনের ॥

কথাটা নীরেন কিছুতেই বিশ্বাস করছিলেন না। ধীরেন্দ্র বেঁচে আছে, কলকাতায় আছে, অথচ একটা যুগ পার হ'য়ে গেল, সে এদিকে একটা দিনের জন্যে মাড়াল না, এ কথা অবিশ্বাস্য।

সুধীর বিরক্ত হ'য়ে বলল—আমার কথা বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

—তোর কোন কথাটা কবে বিশ্বাস হ'য়েছে আমার যে এই গাঁজাখুরি কথাও বিশ্বাস করতে হবে।

—আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি কাকাকে।

—কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস। বেঁচে নেই সে। তা যদি থাকত, তাহ'লে কি সে এমুখো হ'তো না?

—তুমিই ত বল বাবা, তাঁর আসবার মত মুখ নেই। তাছাড়া তিনি এলে তুমি তাঁর হাতে হাতকড়ি পরাবার ব্যবস্থা করবে।

—বলেছি, হাজার বার বলব। কিন্তু সেই শয়তানটার গায়ে কি একরত্তি মানুষের চামড়া থাকতে নেই?

সুধীরের মা কাছেই বসে স্বামী পুত্রের কথাবার্তা শুনছিলেন। স্বামীর কথায় প্রচ্ছন্ন স্নেহের সুর তাঁর কানে গেল। তিনি বললেন —সুধীর ঠাকুরপোকে দেখেছে, এতে অবিশ্বাসের কি আছে? ওতো ঠিকানা টুকে নিয়ে এসেছে বলছে, বিশ্বাস না হয়, যাও না একদিন। গিয়ে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে এস। ভাইকে সাধ্যি সাধনা ক'রে নিয়ে এস বাড়ীতে।

নীরেন মুখখানা বিশ্রী পানা ক'রে বললেন—ব'য়ে গেছে আমার। সে বেঁচেই থাক আর মরেই যাক, আমার তাতে কী? আমার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। একটা ডাকাত, একটা লম্পটের সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ? যে আমার সর্বনাশ করেছে, বিধবা বোনটাকে পথে বসিয়ে গেছে, তার নাম এ বাড়ীতে কেউ উচ্চারণ করবে না এই আমি বলে দিচ্ছি।

সুধীর বললো—যাই বলো বাবা, কাকা বেশ ভালই আছেন। চেহারা আগের মত নেই। তবু আমার চিনতে এতটুকু কষ্ট হয়নি। ওখানে তাঁর কি খাতির।

—ঠিকানা টুকে এনেছিস বললি না?

—হ্যাঁ, এই তো। বাইশ এ রঘুনন্দন লেন।

—তার বাড়ীতে গিয়েছিলি?

—না, কথাও কইনি তাঁর সঙ্গে। তাঁর অজান্তে পিছনে পিছনে গিয়ে বাসাটা দেখে এসেছি। পরে যাব একদিন। কাকা নিশ্চয় একটা চাকরী—

—খবরদার বলছি, ওদিকে মাড়াবে না।

সুধীরের মা বললেন—তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি, যা হ'য়ে গেছে, এ্যাদ্দিন পরে তা নিয়ে মাথা গরম ক'রে কী লাভ?

—খবরদার, কেউ আমার মুখের ওপর কথা বলবে না ব'লে দিচ্ছি।

—মেজাজটাই আছে ষোল আনা। সারাজীবন দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল। বিষ নেই কুলোপানা চক্কর।

—মুখ সামলে কথা বলবে।

—কেন, চুপ ক্ .বা কিসের জন্যে? কি বাহাদুরি করেছ শুনি? কটা মেয়েকে পার করেছ, কটা ছেলেকে মানুষ করেছ?

নীরেন স্ত্রীর মূর্তি দেখে চুপ ক'রে গেলেন।

সুধীরের মা ব'লে গেলেন—আর মুখে কথা নেই। বাক-রোধ হলেও তো বাঁচতুম। লম্বা লম্বা বচন শুনতে হ'ত না কাউকে। ওসব কথা ছেড়ে কাজের কথা ভাব দেখি। রেখাকে বিদেয় কর। সুধীর যে পাত্রটির কথা বলাহল, তার সঙ্গে চেষ্টা ক'রে দেখ। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না আর। মেয়েটাকে শীগ্গীর শীগ্গীর না পার করতো রেলে গিয়ে মাথা দোব ব'লে দিচ্ছি।

সুধীর অস্বস্তি বোধ করছিল। চেষ্টা করছিল মাকে থামাতে। মা আরো রেগে গিয়ে বললেন—তুই বেরো আমার সামনে থেকে।

নিজের ভাইবোন চুলোয় গেল, শালাশালীর ভাবনা ভেবেই মরছে দিনরাত। মর মর মুখপোড়া। তোরা মলে আমার হাড় ক'খানা জুড়োয়। ব'লে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে তিনি উঠে চলে গেলেন সেখান থেকে।

নীরেন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। সুধীর পালাবার তাল খুঁজছিল। গম্ভীর গলায় নীরেন জিগ্যেস করলেন—জগদ্দলের পাত্রটির সঙ্গে কথাবার্তা কইতে যাবি আজ? তা' হলে বিকেলের দিকে যাই।

—বেশ, চল।

পরদিন রুমাকে নিয়ে সুধীর কলকাতা যাচ্ছিল। রুমার আজ ইণ্টারভিউ। যতই সে স্মার্ট হ'ক, ইণ্টারভিউ দিতে যাচ্ছে ব'লে মুখখানা কেমন শুকনো শুকনো। সাদাসিধে ধরনের সাজগোজ করেছে রুমা। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। দেহে ভরা যৌবন। উমার বোনেদের মধ্যে রুমাই দেখতে ভাল। উমার রিষ্টওয়াচটা হাতে পরে এসেছে রুমা। সেদিকে চেয়েই বসেছিল সে। গাড়ীখানা ছুটে চলেছিল কলকাতার দিকে।

বাইরের দিকে চেয়ে সুধীর গতকালের কথা ভাবছিল। বাবার মেজাজ বরাবর এই রকম। মায়ের মেজাজ আজকাল খুব রুক্ষ হ'য়ে উঠেছে। শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে তাঁর। পিসীমা চলে যাওয়ায় তাঁর ওপর সংসারের চাপ এসে পড়েছে। আর খাটনী শরীরে কুলোয় না।

পিসীমা আলাদা বাড়ী ভাড়া ক'রে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেছেন।

কাল বাবার সঙ্গে সে জগদ্দলে গিয়েছিল। বিমলের সঙ্গে রেখার বিয়ের কথাবার্তা অনেকখানি এগিয়েছে। এদিকে রেখার, ওদিকে মেজদির বিয়ে দিতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। অধীর হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে এ বছর। ওর একটা চাকরী হ'লে সংসারে একটু সাশ্রয় হবে। তার নিজের

চাকরীর বোধ হয় আর আশা নেই। শেষ ভরসা, যদি কাকা কিছু ক'রে দেন। সব ঝামেলা মিটে গেলে যাবে কাকার কাছে। বাবাকে না জানিয়ে।

—কি ভাবছেন? রুমা মুখ শুক্‌নো ক'রে জিগ্যেস করল।

—না, কিছু নয়। ব'লে হেসে সুধীর চাইল রুমার মুখের দিকে। জিগ্যেস করল—মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

—কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

—ভয় কি! হাতী ঘোড়া কিছু জিগ্যেস করবে না, কতবার তো বললাম তোমাকে।

—তবু ভয় করে না বুঝি?

—অস্বীকার করছি না। সেইজন্যেই তো আমি রয়েছি সঙ্গে। তুমি যাতে সাহস পাও।

রুমা চুপ ক'রে রইল। একের পর একটা স্টেশন আসছে, চলে যাচ্ছে। বুকের ধুকপুকুনি বাড়ছে রুমার।

একসময় শিয়ালদায় গিয়ে তারা পৌঁছল। তারপর অফিস। অফিসারের কামরা। ইণ্টারভিউ। রুমার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন ক্রমশঃ বেড়ে চলে দ্রুততালে। ঘেমে নেয়ে গেছে একেবারে। মুখখানা শুকিয়ে গেছে। জলতেষ্টা পেয়েছে খুব। জিভটা যেন ভেতর থেকে কিছুতে টানছে। কিন্তু চেয়ে খেতে লজ্জা করল রুমার।

ইণ্টারভিউ হ'য়ে গেল। অফিসার রুমার সার্টিফিকেটগুলো দেখলেন। দু'চারটে মামুলী প্রশ্ন করলেন শুধু। তারপর গম্ভীর মুখে বললেন—আচ্ছা আসুন, পরে জানানো হবে।

জোড়হাতে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে রুমা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজিটারদের টেবিলের কাছে এসে সুধীরের কাঁধে টোকা মেরে বলল—মেয়েদের দিকে চেয়ে কি দেখছেন হাঁ করে? চলুন।

সহাস্যে সুধীর উঠে দাঁড়িয়ে বললো—ওদের দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, কবে থেকে তুমি ওদের একটি সংখ্যা বাড়াবে।

—সত্যি বলছেন?

—সত্যি।

যেতে যেতে সুধীর বললো—কেমন হ'ল?

—ভালই। যা জিগ্যেস করেছেন, সঠিক জবাবই দিয়েছি।

—কিছু বললেন, কবে নাগাদ হবে?

—না। মুখখানা গোমরা ক'রে শুধু বললেন—আচ্ছা আসুন, পরে জানানো হবে।

—ভেবোনা, হয়ে যাবে। ওপর থেকে স্যাংসন আসতে যা দেরী।

—তাই যেন হয়।

জনবহুল রাস্তা দিয়ে ওরা দুজনে চলছিল পাশাপাশি। সুধীর রুমাকে দেখাচ্ছিল সব। টেলিফোন ভবন, বেতারকেন্দ্র, জেনারেল পোষ্ট অফিস, রাইটার্সবিল্ডিং। ডালহৌসী এলাকার এই সব বিরাট বিরাট অট্টালিকাগুলোতে হাজার হাজার মানুষ প্রত্যহ কাজ ক'রে যাচ্ছে মাথা গুঁজে। নথিপত্রে দৃষ্টি মেলে। কাজের চাকা চলেছে পুরোদমে। সকাল থেকে সন্ধ্যে। এদের ভীড়ে রুমাও হারিয়ে যাবে। সকালে নাকেমুখে গুঁজে ছুটবে ট্রেন ধরতে। ডেলি প্যাসেঞ্জারী ক'রে ট্রামবাসে ঝুলে ঝুলে প্রত্যহ গিয়ে অফিসের চার দেওয়ালের মধ্যে তাকে আবদ্ধ থাকতে হবে।

রুমা অবাক হ'য়ে দেখতে দেখতে চলেছিল। বাংলাদেশের হৃদপিণ্ড যেন কলকাতার এই ডালহৌসী এলাকা। এখান থেকেই সহস্র শিরা উপশিরা দিয়ে বাংলাদেশের চারিদিকে রক্ত প্রবাহিত হ'চ্ছে। প্রাণস্পন্দনের উৎস এই জায়গাটি। লক্ষ লক্ষ লোকের অবিরাম পদচারণায় স্থানটি মুখর।

চলতে চলতে কত জনার সঙ্গে গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে। গা শির শির ক'রে ওঠে রুমার। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায়। ছাখে অনেক জোড়া শাণিত দৃষ্টি তার মুখে নিবদ্ধ। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিয়ে সামনের দিকে সে এগোয়।

বউবাজার দিয়ে না গিয়ে সুধীর আজও গেল নেতাজী সুভাষ রো[illegible]তর দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে তারা বড়বাজারে গিয়ে পড়ল। আজ কি দেখা হয় না কাকার সঙ্গে? যে জায়গাটায় পরশু কাকাকে সে দেখতে পেয়েছিল, সেখানে পৌছে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

রুমা জিগ্যেস করল—কি হ'ল? দাঁড়ালেন কেন?

সুধীর জবাব দিল—যদি একজনের দেখা পাই।

রুমা বুঝতে পারল না। ঠোঁটটা ফুলিয়ে চোখ দুটো নাচিয়ে বললো—আর কতক্ষণ হাঁটাবেন? ঐত ট্রাম থেমেছে, উঠুন না। পা ব্যথা করছে।

ওরা দুজনে ট্রামে উঠে পড়লো।

বাড়ীতে গিয়ে পৌছতে সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছিল সুধীরের। সারাদিন ধকল কম যায়নি। কলকাতায় এক কাপ চা খেতেও তারা কোন দোকানে ঢোকেনি। রুমাও বলেনি কিছু।

গা ধুতে যাবার সময় রুমা বলে গেল- বসুন সুধীরদা, চা খেয়ে যাবেন। আমি এই এলুম ব'লে।

উমা বাড়ীতে নেই। তার ফিরতে অনেক দেরী। আজ হয়ত দেখা হবে না। সুধীরকে এক্ষুণি বাড়ী ফিরতে হবে।

গা ধুয়ে, কাপড় চোপর বদলে রুমা এলো জলখাবার হাতে নিয়ে। বেশ হাসিখুশী ভাব। সুধীরের সামনে জলখাবার ধ'রে দিয়ে বললো—বুঝতেই পারছি, খুব ক্ষিদে পেয়েছে আপনার। নিন, গরম গরম লুচি ক'খানা খেয়ে নিন।

—কি ক'রে বুঝলে আমার ক্ষিদে পেয়েছে?

—আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, তাই। নিন, নিন, খেতে আরম্ভ করুন, চা নিয়ে আসছি।

চা, জলখাবার খেয়ে সুধীর বললো—এবার যাই।

হাসিমুখে রুমা বললো—বারে, আজ আপনাকে ছাড়ছি নাকি?

—তার মানে ?

—মানে এসে বলব। বসুন চুপটি ক'রে। আমার পেট জ্বলছে। ব'লে সুধীরের হাত ধ'রে চেয়ারটায় বসিয়ে রুমা রান্নাঘরের দিকে গেল।

খানিকক্ষণ পরে ফিরে রুমা বলল—আজ রাত্রে আপনাকে এখানেই থাকতে বললেন মা।

—না, না, তা হবে না।

—কেন হবে না ?

—তোমার দিদির সেটা ইচ্ছে নয়।

—তার ইচ্ছেয় আপনি থাকছেন না। এটা মায়ের ইচ্ছে।

—আজ আমার বিশেষ কাজ আছে।

—ওসব চালাকি রাখুন।

—চালাকি ?

—তাছাড়া কি ? আমি কি কচি খুকী নাকি ? কিছু বুঝিনে ?

—কি বুঝেছ ?

রাগে ঠোঁট কামড়ে রুমা বলল—আপনি একটি হোপলেস।

—তুমি এত বুদ্ধিমতী, এই সোজা কথাটা এত দেরীতে বুঝলে ? ব'লে সশব্দে হেসে উঠল সুধীর।

রুমা গম্ভীর হয়ে বলল—ঠাট্টা নয়, বিয়ে আপনাদের নামেই হয়েছে, একটা রাতও তো একত্র হ'তে দেখলুম না। এ ভাবে কতদিন চলবে ?

—যতদিন না আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি।

—যুক্তির দিক দিয়ে কথাটা খুবই ভাল শোনাচ্ছে। কিন্তু মায়ের ইচ্ছে কি এ যুক্তিকে খণ্ডাতে পারে না ?

—না। উমা আর আমার মধ্যে এটা একরকম অলিখিত চুক্তি। আমরা কারো ইচ্ছেতেই তা বাতিল করব না। এবার উঠি।

সুধীর উঠে দাঁড়াল। পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রুমা বললো—রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে যাবেন তাহ'লে ?

—রাত্রে আমার আর খাওয়ার দরকার হবে না। এখন চলি রুমা। কিছু মনে কোরোনা যেন।

রুমা একপাশে সরে দাঁড়াল। সুধীর আর একমুহূর্তও দাঁড়াল না সেখানে।

সোজা বাড়ী যাবে এখন সুধীর। মার শরীর খারাপ। কাল রাগারাগি ক'রে হার্টের ব্যারাম বেড়েছে। আজ সকালে বের হবার সময় দেখে এসেছে মা বিছানা থেকে উঠতে পারেননি। না গিয়ে উপায় ছিল না তাই সেই অবস্থা দেখেও তাকে আসতে হয়েছিল। এখন না জানি মা কেমন আছেন। এক রাশ উদ্বেগ নিয়ে বাড়ীর দিকে হন্ হন্ ক'রে পা চালাল সুধীর।

বাড়ী গিয়ে সুধীর দেখল, মা বিছানাতে শুয়ে আছেন। রেখা রান্নাঘরে। বাবা ঘরে বসে গজ গজ করছেন আপন মনে। সুধীর গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। মা মুখ তুলে চেয়ে আবার ফিরিয়ে নিলেন মুখখানা। সুধীর তাঁর শিয়রের কাছে গিয়ে বসল। মাথায় হাত দিয়ে জিগ্যেস করল—কেমন আছ মা?

—এখনো মরিনি। টিকে আছি কোনরকমে।

ধীরে ধীরে হাত বুলুতে বুলুতে সুধীর বললো—পিসীমাকে খবর দেব নাকি?

—পিসীমাকে ডাকা কেন আবার? সে এলে তার সংসার কে দেখবে শুনি? একটু দম নিয়ে বললেন—মিছেই গর্ভে ধরেছিলুম তোকে। বাপ মায়ের কোন কাজেই লাগলি না। চাকরী করলিনে, রোজগারের চেষ্টা দেখলিনে। বিয়ে করলি, বউ নিয়ে ঘর করতেও দিলিনে। কোন্ সাধটা মেটালি বলতো ছেলে হ'য়ে?

নীরেন বলে উঠলেন—আঃ, হার্টের ব্যামো, এত কথা কইছ কেন তুমি? চুপ চাপ শুয়ে থাকো।

—মেয়েটা একলা খেটে খেটে মরছে। ওটা বিদেয় হলে কি হবে? এতগুলো পাতে দুবেলা দুমুঠো সেদ্ধ ক'রে কে দেবে, ভগবান জানেন।

—এত ভাবছ কেন মা, তুমি সেরে উঠবে।

সেকথায় কান না দিয়ে সুধীরের মা বললেন—তুই বৌমাকে ক'টা দিনের জন্যে নিয়ে আসতে পারিস বাছা?

সুধীর বাবার মুখের দিকে তাকাল। কথাটা কানে যেতেই নীরেন প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন—খবরদার, ও কথা মুখে আনবে না, ব'লে দিচ্ছি। বৌমা! কে বৌমা? ওই ছিনাল মেয়েটা?

—বাবা?

—চোপরাও, জুতো মেরে এক্ষুণি বিদেয় করে দোব বাড়ী থেকে। তাকে কোনদিনই এ বাড়ীতে ঢোকানো হবে না। এই সাফ কথা ব'লে দিলাম। আমি কোনদিন তাকে ঘরের বউ ব'লে মানতে পারব না। না, কক্ষণো নয়। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নীরেন।

মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সুধীর বললো—থাক, ওসব কথা তুমি আর মুখে এনো না মা—

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে মা বললেন—এ তুই কি করলি বাবা, কি করলি, ছিঃ!

সুধীরের মুখ দিয়ে একটি কথাও সরল না। সামনের দিকে চেয়ে বসে রইল পাথরের মূর্তির মত। ভেতর থেকে অন্তরাত্মা যেন চীৎকার ক'রে উঠল, ছি, ছি, কি করেছিস, কি করেছিস। বড় বাড়ীর গুমোট হাওয়া যেন ফিস ফিস ক'রে বলে উঠল, কি করেছিস, কি করেছিস।

ছিঃ, এ কি মনের দুর্বলতা? সুধীর দিন দিন যেন দুর্বল হ'য়ে যাচ্ছে। দেহ এবং মনের জোর কমে আসছে।

সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সুধীর উঠে দাঁড়াল। অবিচলিতভাবে বলল—আমি কিছুই অন্যায় করিনি মা। উমাকে আমি এ বাড়ীতে আনবই, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

মা নির্বাক বিস্ময়ে ছেলের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। চোখ থেকে ঝরছিল অবিরাম অশ্রুধারা।

॥ ষোল ॥

ভারতী আজকাল বেশ বুঝতে পারে, ভেতরে ভেতরে তার পরিবর্তন স্বরু হ'য়ে গেছে। সেদিন বিকেলের দিকে নরেশকুমার তাঁর কারখানার অফিসের কামরায় এসে ঢুকলেন। ভারতী বুঝল, এক্ষুণি তার ডাক পড়বে ভেতরে। ভাবতে বিশ্রী লাগে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীকে আজ ডাকলেন না নরেশ। চেয়ারে বসে একটা ফাইল টেনে কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলেন। কোটেশানের ফাইল। মেডিক্যাল অ্যাপারেটাস সাপ্লায়ারদের কোটেশানগুলো আগে দেখতে লাগলেন। স্থনির্মলের লিষ্ট অনুযায়ী মালগুলোর মোট মাট দাম পড়বে হাজার পঞ্চাশের কাছাকাছি।

নাম করা ফার্মের কোটেশান বেশী হ'লেও সেগুলোই দেখতে লাগলেন নরেশ। ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতায় এটুকু বুঝেছেন তিনি, নামী প্রতিষ্ঠান থেকে মাল কিনলে পবে পস্তাতে হয় না। ছোট ছোট ফার্মগুলো দর দেবে এক রকম। বিল করবে অন্য রকম। যে,কোয়ালিটির মাল চাওয়া হয়, সাপ্লাই করে তার উল্‌টো।

তারপর দেখতে লাগলেন ফার্নিচারের কোটেশান। তাতেও হাজার দশেক লাগবে। বেছে বেছে দুটো নাম করা প্রতিষ্ঠানের মূল্যজ্ঞাপক পত্রে সই ক'রে দিলেন নরেশ। এ ছাড়াও ধর্মতলা স্ট্রীটের ঘরখানার জন্যে সেলামী দিতে হবে দশ হাজার টাকা। সত্তর হাজার টাকার চেক কাটতে হবে। তার কমে হবে না।

ভেবেচিন্তে ভারতীকে ডাক দিলেন নরেশ। ভারতী স্থইংডোর ঠেলে ভেতরে গিয়ে অভ্যাসমতো পাশে দাড়ান। নরেশ তার দিকে না চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন,—আলমারী থেকে চেক বইটা বার করো।

নরেশের ড্রয়ার থেকে চাবির রিংটা তুলে নিল ভারতী।

আলমারী খুলে চেক বইটা বার করলো। তারপর আলমারী বন্ধ ক'রে চাবীটা যথাস্থানে রেখে জিগ্যেস করলো—আমি আসি?

নরেশ বিরক্ত মুখে ভারতীর দিকে তাকালেন। তিক্তস্বরে বললেন—চেক বই বার করতে বললাম কি খেলা করার জন্যে? বসো এখানে। চেকটা লিখতে হবে।

ভারতী সামনের চেয়ারে বসে বলল—বলুন, কত টাকা লিখব।

একটু ভেবে নরেশ বললেন—লেখ, সত্তর হাজার টাকা।

ভারতী চেকখানা লিখে সইয়ের জন্য ধরল নরেশের সামনে।

কম্পিত হস্তে সই করলেন নরেশ। আজকাল সই করা ছাড়া লেখার কাজ একেবারেই করেন না। লিখতে গেলে হাত কাঁপে।

সই ক'রে চেকের পাতাটা কেটে নরেশ বললেন—একটা কাজ কর ভারতী। চেকটা তুমি নিজে সুনির্মলকে দিয়ে এসো। সে বাড়ীতেই আছে। আর যে ফার্মের কোটেশানে আমি সই করেছি, সেখানে অর্ডার দিতে ব'লে দাও।

ভারতী চেকটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। নরেশ কোটেশানের ফাইলটা তার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ভারতী বেরিয়ে যেতে গা এলিয়ে দিলেন নরেশ। মনটা কদিন থেকেই খারাপ। মিউজিক স্কুলটা উঠে গেছে। উমা তাঁর সংশ্রব ত্যাগ করাতেই দ্বিজেনবাবু স্পষ্ট ব'লে দিয়েছেন—এখানে আর সুবিধে হবে না।

উমার পরিবর্তনে মনে মনে খুবই কষ্ট পেয়েছেন নরেশ। শেষে উমা কিনা কুকুরগুলোর দলে ভিড়ে গেল। শুধু তাই নয়, লোকমুখে তিনি শুনেছেন, সুধীরের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেছে উমার।

উমা কাঞ্চন ফেলে কাঁচ নিয়ে আঁচলে গেরো বেঁধেছে। কি বিচিত্র মেয়েমানুষের মন। ভোগের থালা তার সামনে তুলে ধরেছিলেন নরেশ। দেহে মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে সেই ভোগের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিল উমা। সেই জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছেন নরেশ।

অসহ্য এই জ্বালা। ভোটে হারিয়ে সুধীরের [illegible] জব্দ করেছিলেন নরেশ। তাতে উমার বাহাদুরি ছিল অনেকখানি। আজ উমার সত্ত্ব অধিকার ক'রে সুধীর তাঁকে ভয়ানকভাবে হারিয়ে দিয়েছে। এটাই হ'ল সুধীরেব মস্ত বাহাদুরি। এই পরাজয় তাঁর বুকে তাই বিদ্ধ হ'য়েছে শেলের মত।

পরক্ষণে মনটা কঠিন হ'য়ে উঠল নরেশের। চুলোয় যাক উমা। তার দেহের বাঁধুনীই ছিল শুধু, রূপ আহামরি কিছু নয়। তার চেয়ে ক্ষীণাঙ্গী কেরানী মেয়েটি রূপসী। ভারতী যেন অনেকটা পোষা জন্তুর মতো। আদর করলে লেপটে যায় গায়ের সঙ্গে। ভারতী অনেক ভাল উমার চেয়ে। অনেক বেশী কমনীয়।

সত্তর হাজার টাকার চেক কেটে ভারতীকে পাঠিয়েছেন সুনির্মলের কাছে। সুনির্মলকে দেবার জন্যেই চেকটা কেটেছেন তিনি। ধর্মতলায় চেম্বার খুলে বসবে সে। টাকাটা লোন হিসেবে সুনির্মলকে দিচ্ছেন তিনি। এ কথা তাকে বলেও দিয়েছেন। রোজগার ক'রে এ টাকা তাকে শোধ দিতে হবে, একথাটাও স্পষ্ট ক'রে শুনিয়ে দিয়েছেন। বলা দরকার। ন'ইলে রোজগারের দিকে মনই যাবে না। যৌবনের ভাবপ্রবণতায় দায়িত্বজ্ঞান থাকে না। হয়ত বিনা ভিজিটেই রোগীর চিকিৎসা করতে সুরু ক'রে দেবে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ভারতীর ফেরার অপেক্ষায় ব'সে রইলেন নরেশ। মনের মধ্যে জাল বুনে চললেন মাকড়সার মতো।

কারখানার অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে ভারতী। বাঁহাতে ফাইল, ডানহাতে ভাঁজ করা চেকখানা। সামান্য একফালি কাগজে সামান্য কয়টা সংখ্যা মাত্র। আর একটা কাঁপা কাঁপা হাতের সই। নরেশের ঢ্যাবঢেবে শরীরের মতই সৌষ্ঠবহীন। এই সামান্য কাগজটাই ব্যাঙ্কে গিয়ে রাশি রাশি অর্থ প্রসব ক'রে এনে দেবে

সুনির্মলকে। সুনির্মল আবার সেই টাকাকে পরিণত করবে লাখ লাখ টাকায়। এরা কোথা থেকে পায় এত টাকা। তারা পায় না কেন? ভাবছে ভারতী। সারা মাসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের বিনিময়ে পায় মাত্র আশী টাকা। তার ওপর কথার জুতো। সহ্য করতে না পেরে পুলিনবাবু চাকরী ছেড়ে চলে গেলেন। নতুন লোক আসেনি। পুলিনবাবুর কাজ সেই চালিয়ে যাচ্ছে। মাইনে বেড়েছে সামান্য। কিন্তু সে নিশ্চয় অন্য কারণে। আর একজন বাবু আছেন। তিনি বাইরে বাইরেই ঘোরেন। তাঁকে মাল গস্ত করতে, ভাড়া আদায় করতে কিংবা এখানে সেখানে অর্ডার সংগ্রহ ক'রে বেড়াতে হয়।

ভারতী এসে ঢুকল নরেশের বাড়ীতে। সোজা ওপরে এসে খোঁজ করল সুনির্মলের। চাকর পশ্চিম দিকের ঘরটা দেখিয়ে দিলে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করলো ভারতী। তারপর পরদা ঠেলে ঢুকলো ভেতরে।

সুনির্মল বড় একটা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধছিল। আয়নায় ছায়া পড়লো ভারতীর। সুনির্মল পেছন না ফিরেই বলল—কিছু বলবেন?

ভারতী কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললো—আপনাকে চেক আর এই ফাইলটা পাঠিয়ে দিলেন মিঃ ব্যানার্জী।

—থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আই ওয়াজ জাষ্ট ওয়েটিং ফর দিস। বাবা কোন পার্টি সিলেক্ট ক'রে দিয়েছেন? ঘুরে দাঁড়িয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভারতীর দিকে চাইল সুনির্মল।

—দিয়েছেন। উনি সই ক'রেছেন কোটেশানে, দেখে নিতে ব'লে দিয়েছেন।

—দ্যাটস অল রাইট। আচ্ছা, আপনি আসুন।

ভারতী তবু দাঁড়িয়ে রইল। চেক আর ফাইলটা ব্যাগে পুরতে পুরতে সুনির্মল বলল আবার—ঠিক আছে, আপনি যান।

ভারতী একবার ইতস্ততঃ ক'রে পা বাড়াল। দরজার কাছ অবধি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটতে সুরু হ'য়ে গেছে, ডাক্তারকে সেকথা খুলে বললে কেমন হয় ?

ভারতীকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সুনির্মলের মনে হ'ল, মেয়েটি তাকে কিছু বলতে চাইছে। কাছে এগিয়ে গেল সে। ভারতীর আপাদ মস্তক দেখে জিগ্যেস করল—কিছু বলবেন ?

চমকে উঠল ভারতী। ডাক্তারের সন্ধানী দৃষ্টি তার দেহে ঘোরাফেরা করছে। কি লজ্জা! কোনওরকমে সে বলল—না কিছু নয়, আমি যাই।

ভারতী তাড়াতাড়ি চলে এল সেখান থেকে। সুনির্মল অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল। কিছু হয়ত বলতে চাইছিল মেয়েটি। লজ্জায় বলতে পারল না। ওর চলে যাওয়ার অসহায় ভঙ্গী দেখে অস্বস্তি বোধ করল সুনির্মল। কি বলতে চাইছিল কে জানে।

ভারতী প্রায় টলতে টলতে আসছিল। হটাং কি দুর্বুদ্ধি মাথায় এসেছিল তার, ভেবে লজ্জা পেল। ভাগ্যিস, ডাক্তারকে সব কথা খুলে বলেনি।

যদি ব'লে ফেলত, সুনির্মল কি করত তাহ'লে? পরামর্শ দেওয়ার বদলে হয়তো রসিকতা করত। তাকে উদ্ধারের পথ বাৎলে না দিয়ে বিদ্রূপ করতো। বলতো—লজ্জা পাবেন না, নিমিত্তের ভাগী যিনি, তার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলুন শীগ্‌গীর।

খুব সামলে নিয়েছে ভারতী। ভাগ্যিস, সুনির্মলের কাছে বলে ফেলেনি। নিমিত্তের ভাগী যিনি, তাঁর সঙ্গে যে গাঁটছড়া বাঁধা যায় না, সে কথাও হয়তো সে প্রকাশ ক'রে ফেলত। মাথা হেঁট হ'ত সুনির্মলের।

কিন্তু এর বিহিত তাকে করতেই হবে। এতদিন সে চুপচাপ থেকেছে। আর নয়। টলতে টলতে অফিসের দিকে এগিয়ে গেল ভারতী।

একটু পরেই সুনির্মল কলকাতা চ'লে গেল। মোটর অপেক্ষা

করছিল বাড়ীর সামনে। মনের মত বাড়ী না পাওয়া পর্যন্ত সে সীট নিয়েছে গ্র্যাণ্ড হোটেল। সাড়ে ছ'টায় গিয়ে পৌঁছবার কথা। সেখানে সান্ত্বনা অপেক্ষা করবে তার জন্যে। একত্রে ডিনার খেয়ে নাইট শোতে তারা যাবে মেট্রোয় সিনেমা দেখতে।

গাড়ীটা স্টার্ট দিতেই সুনির্মল হাতের দামী ঘড়িটার পানে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে ড্রাইভারকে বললো—জাষ্ট টু রীচ এ্যাটসিক্স থার্টি অ্যাট ডেষ্টিনেশন। সাড়ে ছটায় আমাকে পৌছে দেওয়া চাই।

ষ্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে ড্রাইভার জবাব দিল—আচ্ছা।

নিঃশব্দে অফিসে ফিরে নিজের চেয়ারে এসে বসল ভারতী। নিজের ভেতরে ভেতরে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হচ্ছিল সে।

বেশ বুঝতে পারছে, অবৈধ মিলনের ফল হাতে হাতে সে পেতে চলেছে। অবৈধ মিলনের পরিণতি অবৈধ মাতৃত্ব। এই কলঙ্কের বোঝা সে বইবে কেমন ক'রে?

নিজের ওপর দারুণ ঘৃণা হচ্ছিল ভারতীর। পুলিনবাবুকে নমস্য ব্যক্তি ব'লে মনে হ'ল তার। প্রাণের চেয়ে মান তাঁর কাছে বড় ছিল। জুতো ঝাঁটা খেয়ে এখানে পড়ে থাকেননি।

আর সে প্রাণটাকেই বড ব'লে মনে করেছে। চরম অপমানকেও গায়ে না মেখে জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

থাক, একথা অন্য কাউকে জানিয়ে কাজ নেই। শীগ্‌গীর এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। অবৈধ সন্তানকে পৃথিবীতে আনবে না সে।

হঠাৎ সুইংডোর খোলার আওয়াজে মুখ তুলে তাকাল ভারতী। নরেশ তার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে। অবাক হ'য়ে জিগ্যেস করলেন—দিয়ে এসেছ চেকটা?

—হ্যাঁ।

—কখন এসেছ?

—এই একটু আগে।

—তোমার মুখ চোখ অমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ নাকি?

—না, কিছু নয়।

—এসে আমার সঙ্গে দেখা করনি কেন। কাজকর্ম না ক'রে বসেই বা আছ কেন চুপ চাপ?

—কেন শুনবেন? না, এখন থাক। পরে বলব। আজ দয়া ক'রে আমাকে বাড়ী যাবার অনুমতি দিন। উঠে দাঁড়িয়ে নরেশের কপিশ রংয়ের চোখের সঙ্গে নিজের করুণ দৃষ্টি মিলিয়ে বললো ভারতী।

নরেশ কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। গম্ভীর গলায় বললেন—ভেতরে এসো ভারতী। ব'লে নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকলেন। পেছন পেছন ভারতী গিয়ে ঢুকল ঘরে। নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন—ব'সো। ব'লে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

যন্ত্রচালিত পুতুলের মত ভারতী বসল চেয়ারে। মুখখানা উদ্বেগে ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেছে তার।

নরেশ জিগ্যেস করলেন—পরে টরে নয়, এখনি বল, কি হয়েছে?

—যা হবার তাই হ'য়েছে।

—স্পষ্ট ক'রে বল ভারতী।

—বলছি, আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন। এর বেশী কিছু বলতে পারব না। আমাকে যাবার অনুমতি দিন দয়া করে।

—তা যাও, কিন্তু আজ কেন সর্বনাশের কথা তুললে ভারতী। কি হ'য়েছে তোমার, বলবে না?

—বেশ তাহ'লে শুনুন। আমার গর্ভে আপনার—

—থাক, আর বলতে হবে না। তুমি এখন যেতে পার ভারতী।

—এতখানি বলার পর আর একটি কথা না বলে যাব না। দয়া ক'রে শুনবেন?

—বল।

—যেটা আসছে, তাকে আসতে দেওয়া চলবেনা।

—নিশ্চয়ই। সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ী যাও। কিন্তু দেখো, কথাটা কারো কাছে প্রকাশ না পায়।

দুশ্চিন্তার বোঝা খানিকটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ভারতী। টেবিলটা গুছিয়ে, ড্রয়ারে তালা দিয়ে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

গ্র্যাণ্ডে গিয়ে ঠিক সময়েই পৌঁছল সুনির্মল। একটু পরেই সান্ত্বনা এসে পৌঁছল। সুব্রতার সহপাঠিনী। সুব্রতার বিয়েতে শ্যামনগর গিয়েছিল সান্ত্বনা। সেই তাদের আলাপ। এবং সেই সূত্রে প্রেম।

সান্ত্বনাকে প্রথম দেখে সুনির্মলের একটি কথাই মনে হয়েছিল, একই অঙ্গে এত রূপ, দেখিনি তো আগে। সে রূপের বর্ণনা করতে সবিশেষণ একটি কথাই উপযুক্ত। পরমা সুন্দরী।

প্রাক্‌বিবাহকালীন মন জানাজানির পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ ক'রে চলেছে সুনির্মল। এবং তার আগ্রহাতিশয্যে সান্ত্বনাও। তাদের উভয়ের বিবাহ স্থির হ'য়ে আছে, কাজেই অভিভাবকরাও নিশ্চিন্ত।

পরম সমাদরে সান্ত্বনাকে অভ্যর্থনা জানাল সুনির্মল। যথা-সময়ে ডিনার শেষ ক'রে দুজনে গেল মেট্রোতে। ড্রেসিং সার্কেলে দুজনে গিয়ে যখন আসন নিল, সেই মুহূর্তে হলের আলো নিভে গিয়ে আরম্ভ হ'ল শো। সান্ত্বনার নরম একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিল সুনির্মল। দুজনার মুগ্ধ আনন্দিত দুজোড়া দৃষ্টি ছিল সামনের রূপালী পর্দার ওপর প্রসারিত।

॥ সতের ॥

একটা সময় আসে যখন ঘটনা স্রোত একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে থাকে। আবার কখন এক সময় হঠাৎ ঘটনাস্রোত তর তর ক'রে ব'য়ে যায়। এতদিন এক ঘেয়ে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল সুধীরের। কত কাজ করি করি ক'রে করা হয়নি। এতদিন পরে হঠাৎ কোন অদৃশ্য শক্তি যেন ঘটনার আবর্ত্তটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিলে।

রেখার বিয়ে হ'য়ে গেছে বিমলের সঙ্গে। অধীর পাশ করার পর বেলঘরিয়ায় টেক্সমাকোতে চাকরী পেয়েছে একটা। নীরেনের রুক্ষ মেজাজের সামান্য পরিবর্তন হ'য়েছে।

রুমা চাকরী করছে। মোটা মাইনে পাচ্ছে সে। ওদের সংসার মোটামুটি ভালোই চলে যাচ্ছে আজকাল।

কিন্তু সুধীরদের বাড়ীর কাজকর্ম ক্রমশঃ অচল হ'য়ে পড়ছে। তার মা সুস্থ থাকলে উঠে বেশ কাজকর্ম করেন। হার্টের রোগ। বাড়াবাড়ি হ'লেই শয্যা নিতে হয়। সুধীরকে তখন দু'দিক সামলাতে হয়। মায়ের সেবা। সংসারের কাজকর্ম সব। অপটু হাতে রান্না করে সে। বাবাকে খেতে দেওয়া, পান সাজা সবই করে। ভাইদের নাইয়ে খাইয়ে স্কুলে পাঠানো পর্যন্ত।

অনেকদিন থেকেই কাকার কাছে যাবে বলে ভাবছিলো সুধীর। নানান কাজের ঝামেলায় যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি। কয়েকদিন মা সুস্থ রয়েছেন দেখে সে সেদিন বেরিয়ে পড়ল। তার ধারণা, কাকার কাছে গেলেই তার চাকরী একটা নিশ্চয় হ'য়ে যাবে।

পোস্তার ভেতর দিয়ে সেই দীর্ঘ পীচ ঢালা পথ। ডাইনে বাঁয়ে গলির পর গলি। ইটের রাস্তা। ফাঁকে ফাঁকে জল। ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ানো ষাঁড়ের কল্যাণে যেখানে সেখানে গোবর ছড়ানো।

স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত জঞ্জাল। ডাবের খোল, পানের বোঁটা, চায়ের ভাঁড়। পথে চলতে চলতে গাটা কেমন পাক দিয়ে ওঠে।

সুধীর এসে দাঁড়াল মোড়ের সেই চায়ের দোকানটার সামনে। রঘুনন্দন লেনে কাকার বাসার সামনের সেই দোকানটা। গ্রামোফোনে নাকী সুরে হিন্দী গান বাজছে সেদিনের মত। দোকানটা এখন প্রায় ফাঁকা। বেলা তখন বোধ হয় সাড়ে এগারোটার কাছাকাছি।

সুধীর দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দোকানদার তার মুখের দিকে চেয়েই সাদর অভ্যর্থনা জানাল—আসুন বাবু, ভেতরে এসে বসুন। চা দেব ?

সুধীর ভেতরে গিয়ে বসলো। বললো—দাও, এক কাপ চা। লোকটা চা করতে লাগল। মাথায় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল। পাতলা হিলহিলে চেহারা। কিন্তু বেশ মজবুত। দুপাশের দুটো দাঁত সোনায় মোড়া। হাসলে পানের ছোপ ধরা দাঁতগুলোর ভেতরে সে দুটো ঝকঝকে দেখায়।

তাড়াতাড়ি এক কাপ চা তার সামনে এগিয়ে দিয়ে দোকানী জিগ্যেস করলো—বিস্কুট দেব বাবু একখানা ?

—না, থাক।

সামনের বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল সুধীর। এখন যেন ঝিমুচ্ছে বাড়ী খানা। উদ্দাম নৈশলীলার পর এখন শ্রান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছে। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই আবার এর খোপে খোপে সুরু হবে প্রাণচাঞ্চল্য। আদিম রিপুর তাড়নায়, পাশব ক্ষুধায় ছুটে আসবে মানুষ। আকণ্ঠ সুরার স্রোতে ডুবে যাবে তারা। উদ্দাম লালসায় নারীদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশবিক ক্ষুধার সাময়িক নিবৃত্তি ঘটিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে যাবে। একের পর এক। গভীর রাত পর্যন্ত।

—এখন অসময় বাবু, তবু যান তো ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি। সুধীর চমকে উঠল দোকানীর কথায়। এ গলিতে লোকের আসার

অর্থ দোকানীটা জানে। এখানে আসার বুঝি সময় অসময় নেই। পয়সা ফেললেই হ'ল। দিন রাত্রি দরজা খোলা।

সুধীর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—না। আচ্ছা, তুমি ধীরেনবাবুকে চেন?

—ওরে বাবা? চিনিনে আবার! বড়দাকে কে না চেনে এখানে? ঐতো সামনের দোতলার ঘরে থাকেন পরিবার নিয়ে।

—তিনি কি কাজ করেন?

—ও সব আমি বলতে পারব না বাবু। জানতে পারলে বড়দা পেঁদিয়ে আমাকে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে।

—দুপুরে কখন তিনি ফেরেন?

—ঠিক আছে নাকি? কোনদিন বারোটা, কোনদিন একটা আবার কোনদিন দুটোও বেজে যায়।

—অ।

—তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বুঝি বাবু?

—হ্যাঁ।

—কেন বলুন তো?

—না, বিশেষ কিছু নয়। এমনি দেখা করতে এসেছিলাম আর কি। তোমার চায়ের কত যেন দাম?

—ছ নয়া পয়সা।

সুধীর দাম মিটিয়ে দিলে। তারপর আবার সামনের দোতলার বারান্দার দিকে তাকাল। রোদ্দুর যাবে ব'লে একটা চটের পর্দা ঝুলছিল। ভেতরে কাকা আছে কিনা বোঝবার উপায় নেই। কাকা নিশ্চয়ই ঘরে নেই। তা'হ'লে কি চটের পর্দাটা একবারও নড়ে উঠত না? নিশ্চয় তিনি বাইরেই আছেন। তাঁর ফেরার আশায় বাড়ীটার প্রবেশ পথের দিকে চোখ মেলে সুধীর চুপচাপ বসে রইল।

অনেকক্ষণ বাদে নড়ে চড়ে বসল সুধীর। কাকা রিক্শা ক'রে আসছেন। বাড়ীটার সামনে এসে রিক্শাটা থামল। কাকার

চোখে সান গাগ্‌ল্‌। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তিনি ভেতরে ঢুকতে যাবেন এমন সময় সুধীর গিয়ে পেছন থেকে ডাকল—কাকা!

দরজার ভেতরে পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেলেন ধীরেন। 'কাকা' ব'লে এখানে কে আবার কাকে ডাকে? পেছন ফিরে তাকিয়ে সুধীরকে দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন তিনি।

—কে, সুধীর না?

—চিনতে পেরেছেন? সুধীর প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে।

—কি ক'রে এলি এখানে? আমার খোঁজ পেলি কার কাছে?

কড়া রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকা দুঃসাধ্য মনে হচ্ছিল ধীরেনের। সুধীর কোনও উত্তর দিচ্ছে না দেখে ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—যাকগে, তোকে আর বলতে হবে না, ভেতরে আয়।

ধীরেনের পেছন পেছন সুধীর গিয়ে উঠল দোতলায়। একখানা মাত্র ঘর। বেশ বড়। বাক্স পেঁটরা, আসবাবপত্র সব একটি ঘরের ভেতর। কিন্তু পরিপাটী ক'রে সাজানো। একপাশে চৌকিতে বিছানা পাতা। বারান্দায় একজন মহিলা রান্না করছিলেন। সুধীর পলকে ভেতর-বার একবার দেখে নিলে।

ধীরেনকে ফিরতে দেখে মহিলা রান্না ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গে সুধীরকে দেখে ঘোমটা টেনে দিলেন। ধীরেন সহাস্যে বললেন—সুধীর এসেছে, আমার ভাইপো। ঘোমটা দিতে হবে না এক হাত।

সুধীর এগিয়ে গিয়ে একেবারে হঠাৎ পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। মহিলা মাথার ঘোমটা খাটো করে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এক পা পিছিয়েও গেলেন। কিন্তু সুধীর ততক্ষণে পায়ে হাত দিয়ে ফেলেছে। মহিলা এটা ভাবতেই পারেননি। নিজেকে খুবই অপরাধিনী বলে মনে হ'লো তাঁর।

মাথায় হাত ঠেকিয়ে সুধীর সহাস্যে বলল—আমি আপনার ছেলে কাকীমা, পায়ের ধূলো দিতে এমন 'কিন্তু' কেন?

সুধীর উত্তরের আশায় চাইল তাঁর দিকে। সুন্দর গোলগাল গড়ন। রংটা খুব ময়লা। মুখ চোখের গড়ন বেশ ভালই। হাতে মোটা অনন্ত, হাতে শাঁখা, রুলি কয়েক গাছা। গলায় মোটা বিছে হার।

কোনো কথাই তাঁর মুখ থেকে বার হ'লো না। ধীরেন বললেন—আয়, ভেতরে বসবি আয়।

ঘরে গিয়ে জামা ছাড়তে ছাড়তে ধীরেন জিগ্যেস করলেন—খাওয়া হয়নি তো?

—না।

ধীরেন বারান্দায় গিয়ে স্ত্রীকে বললেন—সুধীর এখানে খাবে। হ'য়ে যাবে?

ঘাড় নেড়ে তিনি জানালেন, হ'য়ে যাবে।

স্নান সেরে খেতে বসলো দুজনে। কাকীমা খুব যত্ন ক'রে খেতে দিলেন। চমৎকার রান্না তাঁর হাতের। সুধীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল।

খাওয়া দাওয়ার পর মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লো দুজনে। ওদের খাবার জায়গা পরিষ্কার ক'রে কাকীমা খেতে গেলেন বারান্দায়।

ধীরেন জিগ্যেস করলেন—তারপর? এবার বল, কি মনে ক'রে?

সুধীর অনর্গল ব'লে যেতে লাগল সব কথা খুঁটিয়ে। বাড়ীর কথা, গ্রামের কথা। তাদের দুরবস্থার কথা। বিয়ের কথাও বাদ দিল না। সব একে একে ব'লে গেল। ধীরেন চোখ বুজে শুনছিলেন। একটিও প্রশ্ন করেন নি। একবারও বাধা দেন নি সুধীরকে। দীর্ঘ একটানা ব'লে যাবার পর সুধীর যখন থামলো তখন ধীরেন মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুধু বললেন—হুঁ।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ধীরেন ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লেন। চারটে বেজে গেছে।

বারান্দা থেকে ষ্টোভ জ্বলার আওয়াজ ভেসে আসছিল। কাকীমা বোধ হয় চায়ের জল চাপিয়েছেন।

কাকা মুখ হাত ধুয়ে এসে জামা কাপড় পরতে পরতে বললেন—এখানে থাকবি তো আজ?

—থাকব বলেই তো এসেছি।

—আমি বেরুচ্ছি। যাবি নাকি আমার সঙ্গে?

সুধীর বললো—যাব। চা খেতে খেতে সুধীর বললো—আমি শুধু শুধু বেড়াতে এখানে আসিনি কাকা। একটা চাকরীর জন্যে আপনাকে বলতে এসেছি। আপনাকে ক'রে দিতেই হবে।

—চাকরী? তুই কেন চাকরী করতে যাবি? রাজনীতিই হ'লো তোর আসল কাজ। নেতাদের কত মান সম্মান বল দেখি?

—না কাকা, এড়িয়ে গেলে চলবে না। চাকরী আমায় করতেই হবে। ও সব স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেছে।

—বলিস কিরে! তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন তো সামনে। দেশের আবহাওয়া এখন তোদের দিকে বইছে। এ সময় তোরা যদি হাল ছেড়ে দিস তাহ'লে দেশের অবস্থা কি হবে বল দেখি?

—তাহোক কাকা, দেশের কথা পরে ভাবব আবার। এখন নিজের কথাই একটু ভেবে নি। ইলেক্‌সানের সময় আবার কাজে নামা যাবে, এখন চাকরী ছাড়া আমার চলছে না।

—তাইতো, তোরা করবি চাকরী, তাহ'লে দেশের অবস্থা কোনদিনই বদলাবে না। চল, বেরিয়ে পড়া যাক।

দুজনে বেরুচ্ছেন এমন সময় পেছন থেকে স্ত্রী জিগ্যেস করলেন—কখন ফিরছ?

শুনে ধীরেন সশব্দে হেসে উঠলেন। জিগ্যেস করলেন হাসি থামিয়ে,—তুমি বুঝি ভাবছ, সুধীর আমাকে এত বছর বাদে পেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে?

মৃদুস্বরে উদ্বেগ মিশিয়ে তিনি জবাব দিলেন—অসম্ভব কি? পুরুষ মানুষ তো?

সুধীর বললো—মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন কাকীমা। এ প্রসঙ্গে আপনার ভুলটা আমি ভেঙ্গে দিতে চাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এরকম কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে আসি নি। যদি কোনদিন সে কথা মনে হয়, নিশ্চয় জানবেন, আপনাকে বাদ দিয়ে নয়। কাকা যাবেন, আর কাকীমা যাবেন না, এ হ'তে পারে কখনো?

কি একটা কথা বলবার জন্যে কাকীমার ঠোঁট দুটি থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। ধীরেন সেটা লক্ষ্য করে বললেন—শুনলে তো? এরপর আর কোন কথা বলবে তুমি? ব'লে হাসতে হাসতে সুধীরকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তারপর পোস্তার নানান মহাজনের গদী। সুধীরকে বসিয়ে তাদের সঙ্গে কাজের কথাবার্তা কইতে থাকেন ধীরেন। সে সব ব্যবসায়িক কথার এক বর্ণও বোঝে না সুধীর। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে কাকা তার পরিচয় দিচ্ছিলেন। এমন কথা সব বলছিলেন, যা শুনে লজ্জা পাচ্ছিল সুধীর। ধীরেন সগর্বে তার পরিচয় দিয়ে বলছিলেন—আমার ভাইপো, সুধীর চ্যাটার্জী। একজন নামকরা লীডার—মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ভি দাঁড়িয়েছিল—

লীডারের কথা শুনে সকলে নমস্কার করছিল বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে। হাত জোড় ক'রে। সুধীরের মনে মনে রাগও কম হচ্ছিল না। বাইরে সে ভাব প্রকাশ না ক'রে সাধ্যমতো অবস্থাটা মানিয়ে নিচ্ছিল সে।

রাত্রি নটা নাগাদ বাসায় ফিরলো তারা। দিনের বেলাকার সেই আভাহীন, নিস্তব্ধ বাড়ীটা কোন এক যাদুবলে যেন বদলে গেছে। ঘরে ঘরে পুরোদমে চলেছে হৈ-হুল্লোড়।

ঘরে এসে জামা ছেড়ে বসলো সুধীর। ভয়ানক গুমোট বোধ

হচ্ছিল। ওদিকের জানালাটা বন্ধ। সুধীর উঠে গিয়ে সেটা খুলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তা দেখে আবার বন্ধ ক'রে দিলে জানালাটা। লম্বা বারান্দার সামনে সার দিয়ে মেয়েগুলো সাজগোজ ক'রে দাঁড়িয়ে। মুখের উগ্র প্রসাধনে তাদের গায়ের রং ঠিক বোঝা যায় না। সযত্নে টানা ভ্রূ, ঠোঁটে লিপষ্টিক, চোখে সুর্মা, কপালে কাঁচের টিপ। বিজলী বাতির ঝলকে টিপটা হীরের মত জ্বল জ্বল করছে।

জানালা খোলার আওয়াজে ওরা এদিকে তাকিয়েছিল। সুধীরকে হাঁ ক'রে ওদের পানে চেয়ে থাকতে দেখে হাস্যে লাস্যে ঢলে পড়ল এ ওর গায়ে।

সুধীর তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে দিলে জানালাটা। বসতে বসতে বললে—আচ্ছা কাকা, এমন নোংরা জায়গাতে কেন থাকেন আপনি?

ধীরেন বললেন—হ্যাঁ, বাসাটা বদলাতে হবে। ভদ্রলোকে থাকে না এখানে।

রাত্রের খাওয়া শেষ হ'লো। খেতে খেতে সুধীর লক্ষ্য করল, নীচে রাস্তার ওপর মাতলামী করছে কতকগুলো লোক। ঠিক বাড়ীটার সামনে। নানান ধরনের পোষাকপরা একদল মানুষের জটলা। মাথায় লম্বা, ঝুল ঝুল পোষাকপরা, মাথায় শিরস্ত্রাণ আঁটা কাবুলীগুলোকেই বেশী ক'রে নজরে পড়ে। খদ্দেরদের কাছে সুদ নিয়ে গোলমাল বাধিয়েছে।

কাকীমা তাড়াতাড়ি ওদিকের পর্দাটা টেনে দিলেন। সুধীর লক্ষ্য করছিল, উনি এই জায়গার পরিবেশটা তার চোখের আড়াল করতে সদা সচেষ্ট। তবু আড়াল করতে পারছেন না তিনি। ক্ষণিক বিদ্যুৎ চমকের মত মাঝে মাঝে তা প্রকাশ হ'য়ে যাচ্ছে সুধীরের চোখে।

ধীরেন আর সুধীর চৌকিতে শুল। মেঝেতে কাকীমা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধীরেনের নাক ডাকতে সুরু করল। নতুন

জায়গা ব'লে কিছুতেই ঘুম আসছিল না সুধীরের। থেকে থেকে কানে আসছিল খিল খিল হাসি, নারী-পুরুষের মিশ্রিত কণ্ঠের কোলাহল।

সুধীর ভাবছিল, কাকীমার পূর্ব ইতিহাস কি ওদেরই মতো ছিল? ওই সব বারাঙ্গনাদের মতই একদিন দাঁড়িয়েছেন খদ্দের শিকারের জন্যে সেজেগুজে দরজার সামনে? উনিও কি ওদেরই মতন একদিন ছিলেন বহুভোগ্যা। কেমন ক'রে তাহ'লে কাকার সঙ্গে সংসার পাতলেন? এ জটিল রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত যেন তার স্বস্তি নেই। এ রহস্যোদ্ধার তাকে করতেই হ'বে।

পরদিন একটু বেলায় ঘুম ভাঙল সুধীরের। চোখ মেলতেই দেখতে পেল কাকীমার মুখখানা। কপালে বড় একটা সিঁদুরের টিপ জ্বল জ্বল করছে। চওড়া পাড় শাড়ী পরণে। মুখে একটা পবিত্র প্রসন্নতা ছড়িয়ে রয়েছে।

সুধীর উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙল একবার। জিগ্যেস করল —কাকা কোথায়? কাকীমা বললেন—সে সকালে বেরিয়েছে। তুমি ওঠ, মুখ হাত ধোও। জলখাবার তৈরী করছি।

জলখাবার খেতে খেতে জিগ্যেস করল সুধীর—আচ্ছা কাকীমা, কাকার মুখে আমাদের কথা কিছু শোনেন নি?

—সামান্য সামান্য কানে এসেছে। তোমার কাকার শোনাবার আগ্রহ ছিল। আমারই শুনতে ভালো লাগত না।

—কেন?

—কেন, তা বলতে পারবো না। হয়ত তোমাদের কথা জেনে আমার কোন লাভ নেই ব'লে। যাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না, তাদের সম্বন্ধে জেনে বাজে সময় নষ্ট ক'রে লাভ কী!

—কেন, ইচ্ছে করলেই তো আপনারা যেতে পারতেন।

—পাগল ছেলে! আমি কি ভদ্র সমাজে বের হ'তে পারি?

গতরাত্রের চিন্তাগুলো সুধীরের মনে ভেসে উঠল। উনি যে

পতিতা, এ কথার মধ্যে যেন তারই স্বীকৃতি। এই সুযোগ। ওঁর কথা জানতে হবে এই মুহূর্তে।

সুধীর চায়ে চুমুক দিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে বলল—যদি আপত্তি না থাকে তো বলুন কাকীমা, আপনার কথা।

—এখন কি কথা বলার সময়?

—রান্না আছে তো? আচ্ছা, আমি কুটনো কুটে দিচ্ছি। আমি খুব ভাল পারি কাকীমা, দেখুন। আমার মোচা কোটা দেখে বড়বাড়ীর ঠাকুমা, পিসীমারা সুখ্যাতি করে। পূজোর সময় ভোগের জন্যে মোচার ঘণ্টো হবেই। আমি কেটে না দিলে তাঁদের পছন্দই হয় না। তাছাড়া বাটনা—

কাকীমা হেসে ফেললেন। বললেন,—না বাবা থাক, তোমাকে এখানে কিছু করতে হবে না।

—বলুন তাহ'লে। আমার খুবই ইচ্ছে করছে, আপনার কথা জানতে।

কুটনো কুটতে কুটতে মুখখানা নীচু ক'রে কিছুক্ষণ কি ভবলেন কাকীমা। সুধীর জলযোগ সেরে তাঁর সামনে একটা আসন পেতে বসে বলল—বলুন কাকীমা—

কাকীমা বলতে লাগলেন—আমাদের আবার কথা! কি শুনবে তার? তবু যখন শুনতে চাইছ, শোন তাহলে।

কাকীমা বলে যেতে লাগলেন। সুধীর শুনছিল তন্ময় হ'য়ে। কাকীমা তাঁর জীবনের নাটকীয় ঘটনা বর্ণনা করতে করতে যেন সেই সব পুরনো দিনে ফিরে গেছেন। বর্ণনার সঙ্গে তাঁর অনুভূতিগুলো মিলে মিশে একাকার হ'য়ে যাচ্ছিল। দুঃখ, ক্রোধ, অভিমান, আনন্দ, বেদনার সূক্ষ্ম প্রকাশ দেখা দিল তাঁর মুখে। প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র সেই অভিব্যক্তি। ক্রোধে, অভিমানে কখনো তা আরক্তিম। দুঃখে, বেদনায় চোখ দিয়ে কখনো ঝরছিল অবিরল ধারা। আবার আনন্দের বর্ণনায় মুখে দেখা দিল অনাবিল, স্নিগ্ধ হাসি। মেঘাবৃত আকাশে বর্ষণের পর যেন সুমিষ্ট রোদের ঝিলিক।

খুবই দরিদ্র ঘরে ওঁর জন্ম। বাবা ঘরামির কাজ করতেন। ছোটবেলায় মা মারা যান। বাবাও মারা যান, যখন তাঁর বয়স বছর পনের-ষোল। দাদাও ঘরামির কাজ করতেন। বিয়ে করেছেন। বৌদির চক্ষুশূল ছিলেন তিনি। বুঝতে পারতেন, ঘাড় থেকে আইবুড়ো ননদের বোঝা নেমে গেলে বৌদি বেঁচে যান। বৌদির ওপর কথা বলার সাহস ছিল না দাদার।

দাদা-বৌদি আড়ালে তাঁকে নিয়ে কথাবার্তা কইতেন। তাঁর কানে আসত মাঝে মাঝে। একদিন দেখলেন, ষাট পেরিয়ে যাওয়া এক বুড়ো তাঁকে দেখতে এসেছে। নিজেই বিয়ে করবে ব'লে। তিন তিনটে বিয়ে হ'য়ে গেছে লোকটার। সবাইকে খেয়েছে। একঘর ছেলেপুলে। তাদের সামলানোর জন্যে ডাগর ডোগর মেয়েকে বিয়ে করবেন তিনি।

তখন তাঁর দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে। মনে কত সাধ। শক্তি, সামর্থ আছে, এমন মানুষের হাতে পড়বেন। রোজ এনে রোজ খেয়ে, খাইয়ে সেই মানুষটি সুখী করবে তাঁকে।

ঘাটের মড়া, তালপাতার সেপাই এই পোড়াকাঠের মত চেহারার বুড়োকে দেখে সে স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে গেল। মনে ভাবলেন, এর গলায় মালা দেওয়ার চেয়ে নদীতে ডুবে মরা অনেক সুখের।

লোকটা মোটা টাকা দিয়ে দাদাকে রাজী করিয়েছিল। বৌদি যেখানে হ'ক, তাকে ফেলে দিতে পারলে বাঁচেন। কাজেই তিনি ভালই জানতেন, তাঁর অমতে এ বিয়ে বন্ধ হবে না।

অতএব মরণ ছাড়া পথ নেই। লুকিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে এলেন এক রাত্রে। এক বস্ত্রে

গ্রাম থেকে মাইল খানেক দূরে নদী। সেদিকেই ছুটে চলেছিলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। মনের যা অবস্থা তখন, প্রাণে কোন ভয়ডর ছিল না।

নদীর ধারে পৌঁছে হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপর আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না ক'রে নদীতে ঝাঁপ দিলেন।

স্রোতের টানে ভেসে চলেছিলেন, মনে আছে। তারপর কিছু মনে নেই।

কিন্তু মৃত্যু তাঁর কপালে ছিল না। জ্ঞান হ'তে দেখলেন, একটা খোলার ঘরে তিনি শুয়ে। ঝুঁটিবাঁধা কতকগুলো লোকের কিচিরমিচির কথাবার্তা কানে এল! বুঝলেন, জাতে ওরা উড়িয়া।

বহুক্ষণ বাদে তাঁর জ্ঞান ফিরল। অমনি সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়লো তাঁর ওপর। সকলে একসঙ্গে তাদের ভাষায় প্রশ্ন করে চলেছে—কোথা বাড়ী? কাদের মেয়ে? মরতে চাইছিলেন কেন? আমরা বাড়ী পোঁছে দিয়ে আসব তোমাকে?

বাড়ী ফেরার কথায় তিনি শিউরে উঠে বললেন, না, না।

—কোথায় যাবে তবে?

—আমাকে কেন তোমরা বাঁচাতে গেলে? বেশ তো মরছিলাম ডুবে। এমন শত্রুতা কেন করলে তোমরা? ছেড়ে দাও আমাকে, আমি যেখানে খুশী যাব। ব'লে তিনি উঠে পড়লেন।

ওদের ভেতর একজন বয়স্ক লোক তাঁকে ধ'রে ফেলল। সান্ত্বনা দিয়ে বলল—তোমার মাথার ঠিক নেই এখন। এখানে থাক আজ। বিশ্রাম নাও, পরে যা খুশী ক'রো। তোমার কোন ক্ষতি হবে না মা। কোন ভয় নেই।

সেই বুড়োর কথায় আবার শুয়ে পড়লেন তিনি। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছিল। পরম শ্রান্তিতে চোখ বুজলেন। পরম নির্ভরতায়। ভাবলেন, তবে আর মরে কাজ নেই। এরপর অদৃষ্টে যা আছে, তাই হ'ক।

বুড়ো লোকটা কলকাতার এক মেসে রাঁধুনীর কাজ করত। দেশের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সেখানে। পরের দিন যাবার সময় সে জিগ্যেস করল—আমার সঙ্গে কলকাতা যাবে মা? মেসে কাজ কম্মো করবে, খাবে-দাবে, থাকবে। কারও গলগ্রহ হ'য়ে থাক'তে হবে না। নিজের গতরে খেটে রোজগার করবে। যাবে?

—যাব।

সেই সহৃদয় উড়িষ্যাবাসী বৃদ্ধের সঙ্গে চলে এলেন কলকাতায়। বড়বাজারের একটা মেসে এসে উঠলেন তার সঙ্গে। কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, এটা-সেটা তদারক করা ছিল তাঁর কাজ। বাবুরা তাঁর পান সাজার খুব প্রশংসা করতেন। মেসে বাবুদের ভীড় বেড়ে গেল। তিনি নিজের মত ক'রে বাবুদের সেবাযত্ন করতেন।

তন্ময় হ'য়ে সুধীর শুনছিল। কাকীমা হঠাৎ থেমে যেতেই তাঁর পানে তাকাল সুধীর। আগ্রহের সঙ্গে সুধীর বলল—তারপর?

আরক্তিম মুখে কাকীমা বলতে লাগলেন—এই মেসেই তোমার কাকার সঙ্গে আমার পরিচয়। মানুষটাকে আমার ভালো লেগে গেল। উনি সেকথা বোধ হয় বুঝতে পারলেন। প্রায়ই আসতে লাগলেন তিনি। আমার পান সাজার সুখ্যাতি করতেন। আমাকে মাঝে মাঝে এটা-সেটা দিতেন। আমার সেবার বকশিশ। তারপর মাঝে মাঝে থেকে যেতেন মেসে। আমাদের শেষে কী যে হ'ল, একদিন কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারতুম না। শেষে একদিন তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এখানে এসে আমরা সংসার পেতেছি। কোন দুঃখ নেই মনে। উনি একটি দিনের জন্যেও আমাকে কষ্ট দেননি। একটি দিনের জন্যেও ছেড়ে থাকেন নি আমাকে। আমরা সুখী।

সুদীর্ঘ জীবন কাহিনী শেষ ক'রে থামলেন কাকীমা। সুধীর দেখছিল, চোখে তাঁর জলের দাগ এখনো শুকোয়নি। অথচ মুখে তাঁর তৃপ্তির হাসি। সুধীরের মনে হ'ল, ইনি ভদ্রসমাজে মেশবার অযোগ্যা কিসে? কেন তাঁর মনে নিজের সম্বন্ধে এমন হীন মনোভাব?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল উমার কথা। উমা তার স্ত্রী। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বাবা তাকে বাড়ীতে ঠাঁই দেবেন না কোনদিন। বড়বাড়ীর দরজা তার জন্যে চিরদিনই বন্ধ।

কাকীমাকেই কি বড়বাড়ীর আঙ্গিনায় পা দিতে দেবেন

বাবা? কত ন্যায়রত্ন, তর্করত্নের স্মৃতি, কত কঠিন সংস্কার মনে করে রেখেছেন তিনি। বাবার বয়সী অপর বাসিন্দে ছু'চার জনও। সুধীরের মত নবীন বাসিন্দেরা সেই ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করতে চাইছে। একে কি কোনদিনও ক্ষমা করবেন বাবা?

উমাকে না, কাকীমাকেও না। কাউকে ঢুকতে দেবেন না ঘরে। কিন্তু কি তাদের অপরাধ? কেন থাকবে না তাদের জন্যে বাড়ীর দরজা খোলা?

সুধীর মনে মনে এক কঠিন শপথ নিল। কাকীমাকে আর উমাকে নিজের নিজের মর্যাদায় বাড়ীতে নিয়ে যাবে। এ প্রতিজ্ঞা রাখতেই হবে তাকে। তার জন্যে যে কোন মূল্য দিতে সে প্রস্তুত। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।' তাদেরই গ্রামের এক মহাকবির উক্তি এটা। যাঁর অমরকাব্য অন্নদামঙ্গল। যিনি ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র যাঁর উপাধি এবং নাম।

সুধীর মনে মনে বলল—'যে হোক সে হোক, আরো করিব যতন, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।'

কাকীমাকে নিয়ে যাবে আগে। পথ তৈরী হ'লে উমার আসায় কোন বিঘ্নই থাকবে না আর। এখন চাই শুধু সুযোগ, আর কিছু তার কাম্য নয়।

॥ আঠারো ॥

উনিশশো বাষট্টি সাল। সারা ভারতের সাধারণ নির্বাচন। সুধীর নির্বাচনী কাজে নেমে পড়ল। ছয়টি বামপন্থীদল এবার একত্র জোট বেঁধেছে। নির্বাচনী বক্তৃতায় ব'লে বেড়াচ্ছে নতুন নতুন কথা। বিকল্প সরকার গঠন করবে তারা।

জনসাধারণ অবাক হ'য়ে যায় তাদের কথা শুনে। কংগ্রেসের মত শক্তিশালীদলকে নির্বাচনে হারিয়ে এরা বিকল্প সরকার গঠন করবে। কম দুঃসাহস নয়। তবু বামপন্থী ঐক্য জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হ'য়ে উঠল কলকাতা আর শহরতলীর আকাশ বাতাস। নাম করা কংগ্রেস নেতার পালটা দাঁড়ালেন নামকরা বামপন্থী নেতা। লেগে গেল উভয় পক্ষের মর্যাদার লড়াই। সারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া গরম হ'য়ে উঠল। চারিদিকে শুধুই জল্পনা-কল্পনা, কে জেতে, কে হারে।

ফেব্রুয়ারী-মার্চে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হ'ল। শোচনীয় পরাজয় হ'য়েছে বামপন্থীদলের। খাস কলকাতার রায় যে এমন হবে তারা তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

শ্যামনগর-আতপুর-জগদ্দল কেন্দ্রের বিধানসভার আসনটি হাতছাড়া হ'য়ে গেল কম্যুনিষ্টদের। সুধীর অবাক হ'য়ে ভাবে, কেন এমন হ'লো?

লোকে তাকে দেখলে উপহাস করে। বলে—হেলে ধরবার ক্ষমতা নেই, কেউটে ধরার শখ। বিকল্প সরকার গঠন করবে। মুরোদ কত!

সুধীর হেসেই জবাব দেয়—আপনারা এখানকার লোকসভার আসনটি তো আমাদেরই ছেড়ে দিয়েছেন?

নির্বাচন শেষ হ'লে গ্রামে ফিরে এলো সুধীর। তার

আবার সেই আগের দশা। কাকার কাছে গিয়েছিল ব'লে আবার সে বাড়ী থেকে বিতাড়িত হ'ল। মাস দুয়েক নির্বাচনের কাজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে। তার কর্মক্ষেত্র ছিল প্রধানতঃ কলকাতা।

গ্রামে ফিরে এসে তার থাকা খাওয়ার ঠিক নেই। কোনদিন শুধু চা বিস্কুট খেয়েই কাটিয়ে দেয়। কোনদিন বন্ধুরা জানতে পেরে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়। বাড়ীতে মায়ের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে গড়াচ্ছিল। ভায়েরা হাত পুড়িয়ে যাহোক ক'রে ভাতে ভাত সেদ্ধ ক'রে খায়। এমনভাবে আর কতদিন চলে। সব খবর কানে আসে সুধীরের। মায়ের ক্রমাগত অনুরোধে বাবা অধীরের বিয়ে দিতে মনস্থ করেছেন।

সুধীরের মা বেশ বুঝতে পারেন, এ-যাত্রা আর তিনি সেরে উঠবেন না। বউয়ের হাতে সংসার তুলে দিয়ে চোখ বুজলে শান্তিতে মরতে পারতেন। বরাতে সে সৌভাগ্য আছে কিনা, ভগবান জানেন।

এদিকে সংসারের কাজকর্ম যেন আর চলতে চায় না। সুধীরের মা স্বামীকে একদিন বললেন—অধীরকে ব'লো না, সুধীরকে ডেকে আনুক। বাড়ীর বড় ছেলে। সবাই এসে মিলে মিশে শুভকাজ উদ্ধার করুক। আর সেই সঙ্গে বাড়ীর বড় বউকেও—

সঙ্গে সঙ্গে নীরেন কঠিন স্বরে বললেন—না, সুধীরকে ডাকবে ডাকো, কিন্তু বড় বৌ, বড়বৌ ক'রে চেঁচিও না ব'লে দিচ্ছি। কে তোমার বড়বৌ?

সুধীরের মা চুপ ক'রে যান। বেশী কথা বলতে কষ্ট হয় তাঁর। হাঁপানির টান ধরে এমন যে মনে হয় দম বন্ধ হ'য়ে যাবে। স্বামী যদি তাঁর এই শেষ সাধটুকু পূর্ণ না করেন, তাহলে মস্ত দুঃখ থেকে যাবে তাঁর। মরেও শান্তি পাবেন না তিনি।

অধীরকে ব'লে কয়ে পাঠান সুধীরকে ডেকে আনতে। হাঁপাতে হাঁপাতে অধীরের হাত ধরে বলেন—বাড়ীর বড় ছেলে, সে এসে না

দাঁড়ালে কি ভাল দেখায় বাবা? যেখানে পাস, বলে ক'য়ে হাতে পায়ে ধরে নিয়ে আসবি, যেমন ক'রে হ'ক বুঝলি?

অধীর মাকে সান্ত্বনা দেয়—তুমি কিছু ভেবোনা মা, আমি ঠিক নিয়ে আসবো দাদাকে।

অধীব সুধীরকে ডেকে নিয়ে আসে। মা চোখের জলে ভেসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন—বড় জ্বালা নিয়ে আমি যাচ্ছি বাব', মরার আগে ছুটো দিন শান্তিতে বাঁচতে দে। তোরা সবাই মিলে আমার চোখের সামনে থেকে অধীরের বিয়েটা দিয়ে দে।

সুধীর মায়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকায়। এ কী চেহারা হ'য়েছে তাঁর। মনে হ'চ্ছে মৃত্যু যেন থাবা মেলে তেড়ে আসছে তাঁর দিকে।

শিউরে উঠল সুধীর। মা থাকবেন না, এ যেন ভাবাই যায় না। মা না থাকলে ওদের আসার পথও বন্ধ হয়ে যাবে। কাকীমার আর উমার। নিজের কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করল সুধীর। এই সুযোগ। মা চিরতরে চোখ বোজবার আগে এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে।

সুধীর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—মা, তোমার কথা নিশ্চয়ই শুনবো। অধীরের বিয়ে। খুবই সুখের কথা। বড় ভাই হ'য়ে আমার যতখানি গায়ে গতরে করা দরকার, সবই করবো। কিন্তু একটি কথা আছে মা।

—কি কথা বাবা?

—আমি এ বাড়ীতে আর অন্ন গ্রহণ করবো না।

—সে কি কথা বাবা?

—হ্যাঁ। বাড়ীর বড় ছেলে ব'লে আমাকে ডেকেছ, না ডাকলেও ভায়ের বিয়েতে আসতুম। কিন্তু উমা?

—আমার কি তাকে আনতে অসাধ রে? কিন্তু তোর বাবা যে—

—সে না এলেও তোমাদের কিছু এসে যাবে না। আমি এখানে না খেলেই বা কি এসে যাবে তোমাদের।

সুধীরের কথা শুনে তার মা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

অধীরের বিয়ের দিন-দুয়েক আগে। বিকেলের দিকে সুধীর নীরেনের কাছে বসে বিয়ের বাজারের ফর্দ করছিল। ফর্দ লেখান শেষ হ'লে নীরেন স্ত্রীকে উদ্দেশ্য ক'রে হঠাৎ ব'লে উঠলেন—বাড়ীতে প্রথম ছেলের বিয়ে। আত্মীয় কুটুম্ব না এলেও ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

কথাটা একদিকে শেলের মত বিঁধল সুধীরের বুকে। বাড়ীতে প্রথম ছেলের বিয়ে। অর্থাৎ তার বিয়েটা বাবা বারবার অস্বীকার ক'রে যাচ্ছেন। অপরদিকে আনন্দও হ'লো একটু। আত্মীয় কুটুম্ব আনার কথা তুলেছেন বাবা। এই সুযোগে কাকা কাকীমাকে আনার কথা সহজ হবে।

সুধীরের মা বললেন—তবু ভাগ্যি ভালো, কথাটা মুখ থেকে বার করেছ।

নীরেন চটলেন না। জিগ্যেস করলেন—তাহ'লে বলো, কাকে কাকে আনা যাবে।

—তোমার ক্ষমতায় যেমন কুলোয়, তেমনি আনবে।

কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করা হবে, তার ফর্দ করলেন নীরেন। বাণীর বড়দি, তাঁর মেয়ে-জামাই। নিজের শ্বশুর বাড়ীর সবাইকে। ভায়রাভাইদের। রেখার শ্বশুরবাড়ীর সবাইকে। সুধীর ফর্দ ক'রে যাচ্ছিল। বুঝল, বাবা কাকাকে নিমন্ত্রণ করবেন না।

অতএব সে জিগ্যেস না ক'রে পারল না—কাকাকে বলা হবে না?

নীরেন আমতা আমতা ক'রে বললেন—তা বললে হয়, সবাই যখন—

সুধীরের মা বললেন—আসুক বাপু সবাই। মরার আগে সবাইকে দেখে সাধ মিটিয়ে যাই।

নীরেন ধমক দিয়ে বললেন—তুমি ঐ এক কথা শিখেছ। খালি মরব মরব কর কেন বলত?

বাবার এই শাসনটুকু আজ ভালো লাগল সুধীরের। কাকার বাসার ব্যাপারে উনি যে এক কথায় রাজী হ'য়ে যাবেন, ভাবতে পারেনি সে। পাষাণ হৃদয় তবে বুঝি গলতে শুরু করেছে।

সুধীর উৎসাহিত হ'য়ে বললো—বাজার-হাট কাকাকে সঙ্গে নিয়ে করবো। আমি আজ কলকাতা যাই। কাল বাজার-হাট সেরে কাকা কাকীমাকে নিয়ে আসব।

নীরেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—না, না, ধীরেন আসুক, তাকে এনে কাজ নেই।

সুধীরের মা বললেন—সে আবার হয় নাকি? কি মনে করবে ঠাকুরপো! হয় দুজনেই আসুক, নইলে কেউ আসবে না।

নীরেন আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

টাকাকড়ি, থলেপত্র নিয়ে সুধীর সন্ধ্যের দিকে কলকাতা চলে গেল। মনে মনে বেশ একটা আনন্দ হচ্ছিল তার। কাকা কাকীমাকে আনার চেষ্টা তার সফল হ'য়েছে। কাকীমার জন্যে যদি সে ওঁদের অন্তরে সামান্য একটু ঠাঁই ক'রে দিতে পারে, তাহলে মস্ত একটা কাজ করা হবে। বাবার কাছে সুধীর কাকীমার সব কথাই তো খুলে বলেছে। সব জেনে-শুনেও ত কাকীমাকে আনবার কথায় তেমন অটল হ'য়ে থাকেন নি। যতখানি হ'য়েছেন উমার বেলায়?

পাষাণ যখন একবার গলতে শুরু করেছে, তখন আর ভাবনা নেই। তার উদ্দেশ্য যে এত সহজে সিদ্ধ হবে ভাবতেই পারেনি সুধীর। কাকীমা এসে পথ তৈরী ক'রে দিলে তখন উমার আসার নৈতিক কোন বাধাই থাকবে না। কাকা কাকীমা যদি ঘরের ছেলে-বৌ হিসেবেই মর্যাদার সঙ্গে বড়বাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন কি বাবা উমাকে দূরে ঠেলে দিতে পারবেন?

কাকার বাসায় গিয়ে সুধীর পৌছিল রাত্রি আটটার পরে।

কাকা তখনো ফেরেন নি। কিছুক্ষণ কাকীমার সঙ্গে গল্প গুজব ক'রে কাটাল সুধীর। কাকা ফিরলে এক সঙ্গে খেতে বসল দুজনে। কাকীমাকে কথাপ্রসঙ্গে অধীরের বিয়ের কথা বলেছে সে। হাট-বাজার করতে এসেছে, সেকথাও জানিয়েছে। তাঁদের নিতে এসেছে, একথা জানায় নি। কাকা এলেই জানাবে বলে ভেবেছে সে।

খেতে খেতে তাঁদের যাবার কথা পাড়লো।

সব শুনে কাকীমা বললেন—আমি যেতে পারবো না।

অবাক হ'য়ে সুধীর জিগ্যেস করল—কেন কাকীমা?

—ভদ্রসমাজে আমাদের ঠাঁই নেই।

—কে বলেছে একথা? আছে কি নেই, গেলেই বুঝতে পারবেন। না থাকলে ক'রে নিতে হবে না আপনাদের? আপনি কিছু ভাববেন না। কোনদিক দিয়ে আপনার কোন অসম্মান হবে না। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে।

ধীরেন বললেন—শুধু সুধীর যদি যাওয়ার কথা বলতো, তাহলে অবিশ্যি যাওয়ার কথাই উঠতো না। দাদা, বউদি যখন যেতে বলেছেন, এরপর না গেলে খারাপ দেখাবে।

—আমি কাউকে চিনি না, জানি না,—চলতে ফিরতে সব সময় লোকে আমাকে দেখে গা টেপাটিপি করবে, সে আমার সহ্য হবে না। তার চেয়ে বরং তুমি একলা যাও।

—তুমি ভুল করছ। তুমি যাচ্ছ আমার স্ত্রী হিসেবে। মন্ত্রপড়া বউ না হলেও আমরা স্বামী-স্ত্রী, একথা স্পষ্টই তাদের জানিয়ে দিও।

—অন্য সময় হলে যেতে আপত্তি করতুম না। কিন্তু বিয়ের মত একটা শুভ কাজে গিয়ে আমি অকল্যাণ করতে চাই না। বামুনের ঘরের বিয়ে। আমি নীচু জাত হয়ে সেই সব আচার-বিচারের মধ্যে যাই কী করে? যদি বরকনেকে বরণ করতে এগিয়ে যাই, তাহ'লে সেটা কি সকলের চোখে দোষের হবে না?

সুধীর জবাব দিল—হবে নিশ্চয়ই; কিন্তু এগিয়ে আপনাকে যেতেই হবে। পিছিয়ে থাকলে কেউ তো আপনাকে ডাকবে না।

—বেশ, যাব তাহ'লে।

বাজার-হাট সেরে পরদিন কাকা কাকীমাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো সুধীর। বাড়ী সরগরম। এরা গিয়ে পৌঁছতেই আনন্দ কোলাহল পড়ে গেল। বাড়ীতে হারানিধি ফিরে এলে যেমন বাপ-মায়ের আনন্দ হয় তেমনি আনন্দ অনুভব করলেন নীরেন। আচরণে অযথা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল না তাঁব। সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। পিসীমা ও অতীতের গ্লানি ভুলে গিয়ে সহাস্যমুখে এসে কাকীমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

দেখে খুবই আনন্দ হচ্ছিল সুধীরের। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ঠিক এই রকম অভ্যর্থনা যদি আজ উমার কপালেও জুটত। 'যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।' মনে মনে শপথবাণী আর একবার উচ্চারণ করল সে।

এসে অবধি লক্ষ্য করছে সে কাকীমাকে। কেমন খাপ খাইয়ে নিয়েছেন সকলের সঙ্গে। বাঁধ ভাঙ্গা ঢেউয়ের মত উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছেন যেন। ছোটাছুটি করছেন এ-ঘর থেকে সে-ঘরে। চেনা অচেনা সকলের সঙ্গে নিজ আলাপ করছেন। কাজ করতে বসে যাচ্ছেন হয়তো কাজের লোকের সঙ্গে। কোনদিক দিয়ে তাঁর আচরণে এতটুকু ত্রুটি নেই। দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সুধীর।

বিয়ের দিন দুপুরে সুধীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে, এমন সময় তার ছোট ভাই এসে পেছন থেকে ডাকল—বড়দা ?

—কিরে ?

—মা তোমাকে ডাকছে একবারটি, শুনে এস বড়দা।

সুধীর যেতে গিয়ে ফিরে জিগ্যেস করল—ডাকছেন কেন রে ?

—তা জানিনা, শীগ্‌গীর যাও।

সুধীর দেখা করতে গেল মায়ের সঙ্গে। ভয়ানক শ্বাসকষ্ট উঠেছে তাঁর। বিছানার সঙ্গে যেন মিশে গেছেন। তবু মনের জোরে এখনো টিকে আছেন কোন রকমে। মায়ের অবস্থা দেখে সুধীরের চোখে জল এল।

মা অনেক কষ্টে বললেন—আমার মাথা খাস বাবা, না খেয়ে বাড়ী থেকে যাস নে। শুভকাজে অকল্যাণ হবে।

সুধীর আত্মসম্বরণ ক'রে বলল—তোমার মাথা তো খেয়েই ফেলেছি মা। বাকী আছে কিছু? কিন্তু এমন আদেশ কোরো না মা, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি।

সুধীরের মা জোরে কেঁদে উঠলেন। পিসীমা, কাকা, কাকীমা ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। কাকার হাত দুটি ধ'রে সুধীরের মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললেন—তোমার দাদাকে যেমন ক'রে হ'ক বোঝাও ভাই, মরার আগে সাধটুক্ মিটিয়ে যাই।

—কি বোঝাতে হবে বল বৌদি।

—আজ শুভদিনে সুধীর বাড়ীতে জলগ্রহণ করবে না, মা হ'য়ে সেটা আমি কেমন ক'রে সহ্য করি বলো?

—কেন, কি হ'য়েছে?

—বাড়ীর বড় ছেলের বৌ, সে রইল দূরে, ও পণ করেছে, বাড়ীতে দাঁতে কুটো কাটবে না। যাও ভাই, বড় বৌমাকে তোমরা আনো ব'লে ক'য়ে। দু-বৌয়ের মুখ দেখে আমি নিশ্চিন্তে মরি।

—তুমি ভেবোনা বউদি। আমি এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি।

ধীরেনের কথা শোনামাত্র নীরেন জ্বলে উঠলেন তেলে-বেগুনে। মুখে সেই এক কথা—আমি তাকে পুত্রবধূ ব'লে ঘরে ঠাঁই দিতে পারবো না।

—কেন? কি তার অপরাধ?

—তুই আর আমাকে ঘাঁটাসনি ধীরু। এ গ্রামের কে না জানে সেই মেয়েটার কেচ্ছার কথা? তার কি চরিত্রের ঠিক আছে কিছু?

নরেশের রক্ষিতাকে আমার ঘরে প্রাণ থাকতে আমি জায়গা দেব না।

সুধীর এতক্ষণ ধৈর্য ধ'রে ছিল। আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না। ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে সে বলল—হ্যাঁ, তোমার বন্ধুর রক্ষিতা সে একদিন ছিল বটে। আজ সে আমার স্ত্রী। তুমি গর্ব করতে পারো, ঐশ্বর্যের মোহে যে মেয়ে বিপথে যায়, তাকে তোমার ছেলে ফিরিয়ে আনে মর্যাদা দিয়ে।

নীরেন রাগে কাঁপতে কাঁপতে পা থেকে চটি খুলতে যাচ্ছিলেন। ধীরেন তাঁকে ধ'রে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁকে ঠাণ্ডা ক'রে শান্ত স্বরে বললেন—দাদা, আমরা চললাম।

—কেন?

—এরপর আমাদের থাকা চলে না। সুধীরের বউয়ের যদি এখানে স্থান না হয়, তাহ'লে আমাদেরও হওয়া উচিত নয়।

সুধীরের পিসীমা এসে বললেন—আমিও চললাম দাদা।

অধীর সব শুনে কেঁদে ফেলল। বলল—আমিও চললাম বাড়ী থেকে, বিয়ে চুলোয় যাক।

নীরেন অসহায় ভাবে সকলের মুখের দিকে চাইলেন। বড় বাড়ীর আভিজাত্যটুকু তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চেয়েছেন। ব্যর্থ হ'য়ে গেলেন তিনি। নতুনের প্রাণ বন্যার স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে। ভগ্নকণ্ঠে বললেন—সবাই যদি চলে যাস, তবে আমি থাকব কাকে নিয়ে? যা খুশী কর তোরা। আমি আর একটি কথাও বলবো না।

অধীর নিজে গিয়ে উমাকে নিয়ে এল। উমা ছিল এই ডাকটুকুরই অপেক্ষায়। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এল। শ্বশুরকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো মাথায় নিতেই তিনি অবরুদ্ধ স্বরে বললেন—তোমার শাশুড়ী যায়-যায় অবস্থা। তুমি তাঁকে গিয়ে দেখ বৌমা।

উমা ঘরে ঢুকতেই রেখা সজোরে শাঁখটা বাজিয়ে দিল। কাঁপা

কাঁপা শাঁখের আওয়াজে একই সঙ্গে বেজে উঠল আগমনী ও বিজয়ার সুর।

কাকীমা উমার হাতটা ধ'রে জায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—এই দেখ দিদি, তোমার বড় বৌ এসে গেছে, চেয়ে দেখ।

সুধীরের মা বললেন—তোমরা দুজনে বস আমার দুপাশে। আমি দেখি।

অধীরের বিয়ে হ'য়ে গেল নির্বিঘ্নে। ফুলশয্যাও হয়ে গেল তার। পরের দিন সুধীরের মা চোখ বুজলেন। তাঁর সাধ মিটেছে। আর বুঝি কোন দুঃখ ছিল না তাঁর।

একদিকে মৃত্যুপথযাত্রিণী সুধীরের মা। অন্যদিকে অধীরের বিয়ের নিরানন্দ উৎসব। দুইই শেষ হ'ল।

একই দিনে গ্রামের অপর প্রান্তে বইছিল আনন্দের বন্যা। সুনির্মলের বিয়ে। বাড়ীর সামনে সুসজ্জিত মণ্ডপে ভোর হতে বসেছিল বাদ্যকরের দল। সানাইয়ের সুমিষ্ট রাগিণী বাজছিল থেকে থেকে। আত্মীয়, পরিজন, নিমন্ত্রিতদের কলরবে সারা বাড়ীখানা মুখরিত। কোথাও এতটুকু বেদনার লেশমাত্র নেই। রঙীন আলোয় যেমন ঝলমল করছিল বাড়ীখানা, তেমনি খুশীতে ঝলমল করছিল সকলের মন।

মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে সুধীর কাকীমাকে কলকাতায় পৌঁছে দিল। কাকা আগেই চলে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে শিয়ালদায় শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে দেখা। মুণ্ডিত-মস্তক সুধীরকে শশাঙ্কশেখরই আগে দেখতে পেলেন। ট্রেনে ফেরার পথে তিনি বেদনার্ত স্বরে বললেন—তোমার মা মারা গেছেন শুনেছি। গিয়ে যে দেখা করে আসব, সে ফুরসৎ পাইনি। পরীক্ষার খাতা দেখায় ব্যস্ত ছিলাম। আজ লাষ্ট ইনস্টলমেন্ট জমা দিয়ে এলাম। এখন নিশ্চিন্তে কাটবে কটা দিন। কি হয়েছিল মায়ের?

—হার্টের অসুখে মা অনেকদিন থেকেই শয্যাশায়ী ছিলেন।

—ভুগেছেন খুব, কি বল?

—হ্যাঁ।

একটু থেমে সুধীর বললো—শশাঙ্কদা, একটা কথা জিগ্যেস করবো আপনাকে?

—নিশ্চয়।

—আপনি স্কুল-কমিটির একজন সভ্য। আপনি নিশ্চয় জানেন ওখানের ক্লার্ক নাকি চাকরী ছেড়ে দিয়েছে?

—মিটিং না হলে পাকা খবর শুনতে পাবো না। কানাঘুষোয় সেই রকমই শুনছিলাম বটে। ভদ্রলোক হাই ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন। সেই কারণেই ছেড়েছেন বোধ হয়। কেন বলত?

—বলছি, কিছু মনে করবেন না?

—না, না, বল।

—আমার তো কোন সুরাহাই আজো হল না শশাঙ্কদা। আমার জন্যে একটু চেষ্টা করতে পারেন না? আপনারা থাকতে আমাকে কি না খেয়ে মরতে হবে?

শুনে শশাঙ্কশেখর নীরবে ভাবতে লাগলেন। সত্যি, তাঁর যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে সুধীরের কথা নিশ্চয়ই রাখতেন। কিন্তু আশঙ্কা হয় তাঁর, নিজের ইচ্ছে তিনি সফল করতে পারবেন না হয়তো। সুধীর সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। আর পাঁচ-জনকে নিয়েই তো কমিটি। তাঁকে একা নিয়ে নয়।

সুধীর ওঁকে নিরুত্তর দেখে আবার বলতে লাগল—আপনাকে কী আর বলব, আমার কথা কিছুই অজানা নয় আপনার।

চিন্তিত মুখে জবাব দিলেন শশাঙ্কশেখর—সব জানি ভাই। আমাকে এত করে বলতে হবে না। দেখি, কতদূর কি করতে পারি।

এ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে হঠাৎ শশাঙ্কশেখর প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা সুধীর, অরুণার খবর জানো?

—নানান ঝামেলায় কাটাচ্ছি, খোঁজখবর রাখিনি অনেক দিন।

—আজ খাতা জমা দিয়ে ফিরছিলাম। মিনার থিয়েটারের

পাশেই হেড্‌একজামিনারের বাড়ী। ফেরার পথে টিকিট কেটে ঢুকে গেলাম। দেখি, অরুণা নায়িকার পার্ট করছে। ও আবার কবে থিয়েটারে যোগ দিল ?

—এ খবরটা আমি জানি। বিজিতের সঙ্গে ওর আজকাল বনিবনা হচ্ছে না এ নিয়ে। শুনছিলাম, ও নাকি ডাইভোর্স করবে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।

শশাঙ্কশেখর সুধীরের জন্যে কথাবার্তা কইতে গিয়েছিলেন একজন কমিটি মেম্বরের সঙ্গে। সুধীরের পক্ষে অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি। কে কার কথা শোনে। দুনিয়ায় যারা সবজান্তা হয়ে বসে আছে তাদের বোঝায় কার সাধ্য। মাননীয় সভ্য যুক্তি তর্কের ধার দিয়ে গেলেন না। ব্যক্তিগত কুৎসায় মুখর হয়ে বললেন তিনি—ঐ রকম একটা স্কাউণ্ড্রেলকে স্কুলে ঢোকালে সর্বনাশ হবে।

বাধা দিয়ে শশাঙ্কশেখর বলেন—কি বলছেন আপনি ?

—তুমি থাম তো হে! তুমি আর ওর হয়ে ওকালতি করতে এসো না। যা বলছি, ঠিক বলছি। কেন, রাজনীতি করুক না। এম. এল. এ. হবে, মন্ত্রী হবে, তাই হক।

—দেখুন, এ সব অবান্তর কথা বলা হচ্ছে না ?

—ছোঁড়া দেখছি তোমার মাথাটাও চিবিয়ে খেয়েছে। আহা, তুমি বুঝতে পারছ না, কতবড় অপদার্থ ও! রোজগারের নাম নেই, আবার বিয়ে করে বসে আছে। আমার মতে, ওকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে চাবকানো উচিত। ওর চেয়ে মেয়েটা শতগুণে ভালো। বাহাদুর আছে বলতে হবে। মাসে শতখানেক টাকা রোজগার করে।. শোনা যাচ্ছে, মেয়েটা ওকে বিয়ে করে এখন অনুতপ্ত। ছেড়ে দোব দোব করছে।

আর শোনবার ধৈর্য ছিল না শশাঙ্কশেখরের। উঠে চলে এলেন। আগামী সপ্তাহে ঐ পদের জন্যে ইণ্টারভিউ হবে।

প্রার্থীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। নব্বই টাকা মাইনের কেরানীর জন্যে বি. কম. পাশ প্রার্থীও দরখাস্ত করেছে। ন্যায়বিচার করতে গেলে সুধীরের চাকরীর আশা কোথায়?

সেদিন রাত্রে কলেজ থেকে ফেরার পথে উমার সঙ্গে দেখা হল শশাঙ্কশেখরের। উমা টিউশিনি সেরে ফিরছিল নৈহাটী থেকে। শ্যামনগর স্টেশনে সাক্ষাৎ হল দুজনের। উমা তাঁকে বলল—সুধীরকে কাজটা করে দিতেই হবে শশাঙ্কদা।

—চেষ্টা করব ভাই।

—আপনি চেষ্টা করলেই হবে।

শশাঙ্কশেখর হাসলেন। বললেন—তাই যদি হয়, তাহলে জেনো সুধীরের নিশ্চয়ই চাকরীটা হবে। আমার চেষ্টায় কোন ভেজাল নেই।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান, আপনার কথার কোন মূল্য নেই কমিটির কাছে?

—মেজরিটির মতই যেখানে আসল, সেখানে কথাটা তাই দাঁড়ায়।

—যাই হোক দেখুন, কী করতে পারেন।

উমা নীরবে পথ চলতে লাগল। শশাঙ্কশেখর পাশে পাশে চলছেন। একটু বাদে গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে বললেন—উমা, একটা কথা জিগ্যেস করব, রাগ করবে না বল?

হেসে উমা বলল—কি যে বলেন শশাঙ্কদা? রাগ করতে যাব কেন?

—কথাটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কিনা।

—বলুনত শুনি।

—তুমি কি সুধীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দেবার কথা ভাবছ উমা?

—কার মুখে শুনেছেন একথা?

—সে কথা নাই বা শুনলে'। সত্যি কিনা বলবে ? অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।

উমা দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল—সম্পূর্ণ মিথ্যে, শশাঙ্কদা। আপনি বিশ্বাস করেন ওদের কথা ?

শশাঙ্কশেখর বললেন—শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। মনে মান ভাবলেন অরুণা সম্বন্ধে যা শুনেছেন, তাও হয়ত মিথ্যে। এরা দুজনেই তাঁর চোখে অনন্যা।

রাস্তার মোড়টাতে এসে উমা বললো—চলি শশাঙ্কদা।

—আচ্ছা এসো।

উমার দোলায়িত বেনীটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শশাঙ্কশেখর বাড়ীর পথ ধরলেন।

শেষ